ফ্রাঙ্কো পোলির

নীল অন্ধকার

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

কিশোর ক্লাসিক

কিশোর ক্লাসিক

ফ্র্যাঙ্কো পোলি-র

নীল অন্ধকার

রূপান্তর: কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1434-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

NEEL ANDHOKAR
By: Francois Poli
Trans by: Qazi Maimur Husain

সেবা প্রকাশনী

ত্রিশ টাকা

রকিব চাচাকে,
যিনি বইটি হাতে দিয়ে বলেছিলেন
এটা অনুবাদ করো। তাঁর কাছে
আমি ঋণী হয়ে রইলাম।

এক

স্পেনের পোর্ট কোরানার দুই নম্বর জেটিতে অপেক্ষা করছে ইটালিয়ান যাত্রীবাহী জাহাজ অউরিগা, ক্যারিবীয়ান যাত্রার জন্যে প্রস্তুত। নোঙর তুলবে একটু পরেই, প্রতি দশ সেকেন্ডে একজন করে হারিয়ে যাচ্ছে ওটার ধূসর পেটে। এঞ্জিনটার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে গুড়গুড় করে আপত্তি জানাচ্ছে ঢাউস পেট।

জেটিতে ভয় পেয়ে থম মেরে যাওয়া বাচ্চা আর হরেক মালামালের বোঁচকার চারপাশে গোপন বিচ্ছেদ বেদনায় নীরবে অপেক্ষা করছে আরও দুই হাজার যাত্রী। কেমন যেন একটা উত্তেজনা মাখা নীরবতা, যেন উঁচু হারে জুয়া খেলার টেবিল ঘিরে বসে থাকা অধীর খেলোয়াড় ওরা। তার কারণও আছে; জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সবাই চলেছে এই ক্যারিবীয়ান অভিযানে, ভাগ্যে কি আছে কেউ তা জানে না। গ্যাংপ্ল্যাঙ্কে ওঠার আগে, পথে বিছানো পাথরের মাঝ থেকে, চোরের মতো চট করে খাবলা দিচ্ছে অনেকে, উবু হয়ে তুলে নিচ্ছে মাটি। বাকিরা, যারা আগেই বিভিন্ন ডেকে স্থান নিয়েছে, তাদের মধ্যে যাদের মাউথ অর্গান আছে, বাজাচ্ছে তারা বিষণ্ন সুর, মনে পড়িয়ে দিচ্ছে বন্দর ছেড়ে চলে যাবে জাহাজ আর কিছুক্ষণ পরেই। ভাবতে গেলেও অবাক লাগে, নিয়তি হয়তো তাদের আগেই চিহ্নিত করেছে, যারা ফিরে আসবে পকেট ভরা ডলার নিয়ে।

কুরাকাও, ত্রিনিদাদ, জ্যামাইকা, হাভানা··· কোথায় যাবে সে

সম্বন্ধে আপাতত মহিলারা অসচেতন; নামগুলোর আকর্ষণে মোটেও মোহিত না হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অনেকে।

এত মানুষের ভিড়ে আমিই একমাত্র প্রাণী, যে স্পেন ছেড়ে চলে যাবার কারণে মোটেও দুঃখিত নই।

আমিও ক্যারিবীয়ানেই যাচ্ছি, তবে নতুন জীবন শুরু করতে নয়, আমি যাচ্ছি হাঙর শিকারে।

গতবছর গ্রীষ্মে যখন প্যারিসে ছিলাম, তখনই হাভানা থেকে সদ্য ফেরা এক বন্ধুর কথা শুনে মনস্থির করে ফেলেছি, যাব আমি হাঙর শিকারে।

'ওখানে তুমি বাসের সমান একেকটা হাঙর পাবে,' ও বলেছে আমাকে, 'কোন কোনটা এতই বড় যে মোটা একটা গাছের গুঁড়িকেও এক কামড়ে দু'টুকরো করে ফেলতে পারবে–সত্যিকার প্রাগৈতিহাসিক দানব...'

তখনও পর্যন্ত আমার মাছ ধরার অভিজ্ঞতা বলতে গোটা ছয়েক গ্রীলেস। ওগুলো আমি কপাল গুণে কি করে যেন ধরে ফেলেছিলাম আমার বয়স যখন বারো থেকে তিরিশ, এই আঠারো বছরে। পানি থেকে মাছ ওঠানো যা-তা ব্যাপার নয়, কিন্তু তাতে আমি দমে গেলাম না। আমার ধারণা হলো সমুদ্রে সাধারণ মাছ ধরা আর হাঙর শিকার একই কথা। কিংবা এভাবেও বলা যেতে পারে যে ফড়িঙ শিকার বা বাঘ শিকারে কোন পার্থক্য নেই। এবছর তাই বিন্দুমাত্র চিন্তান্বিত না হয়ে স্পেনে যাবার ট্রেনে চেপে বসলাম আমি। স্পেনে পৌঁছে উঠে বসলাম জাহাজে। এই জাহাজ আমাকে নিয়ে যাবে শীত প্রধান ইউরোপ থেকে তিনটি হাজার মাইল দূরে।

রেলিঙে হেলান দিয়ে এখন অপেক্ষা করছি আমি, শেষ অভিবাসী উঠে পড়লেই জাহাজ ছেড়ে দেবে।

রাত আটটার সময় উঠল লোকটা। অধৈর্য আমাকে খুশি করে তিনবার ছোট ছোট সাইরেন বাজাল অউরিগা, তারপর নোঙর

তুলে হেলেদুলে ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল খোলা সাগর অভিমুখে। সতেরো দিন পর গন্তব্যে পৌঁছবে জাহাজ।

এই সতেরো দিনে আমি পরপয়েজ দেখলাম, চোখে পড়ল জেলি ফিশ, একটা ফ্রেইটার আর ফ্লাইং ফিশ; কিন্তু কোন হাঙরের পাখনা দেখারও সৌভাগ্য আমার হলো না।

কিউবার উপকূল যখন দেখতে পেলাম, জাহাজের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি তখন হাজারতম বারের মতো, ভাবছি শীতকালে এসে ভুল সময়টা বেছে নিয়েছি কিনা। জানতাম না যে সারাবছরই হাঙর শিকার করা যায়, এবং পানির ওপরে ওদের বড় একটা দেখা যায় না বললেই চলে। যে ছয় মাস হাঙর শিকার করেছি, যেখানেই আমি গিয়েছি, সে ক্যারিবীয়ানেই হোক বা মিঠে পানির দানবীয় হাঙরের আবাস লেক নিকারাগুয়াতেই হোক, কিংবা প্রশান্ত মহাসাগরে, চোখে দেখা যায়, সাঁতরাচ্ছে, এমন হাঙর দশবারোটার বেশি আমার নজরে পড়েনি।

অমানুষিক পরিশ্রম করে হুকে বাধিয়ে ওদের তুলে আনতে হয়। হত্যা করা হয় জাহাজ বা বোটের পাশে তুলে এনে মুগুর দিয়ে পিটিয়ে।

হাভানা বন্দরের কাছে পৌঁছে গেছে জাহাজ, আর একটু পরেই পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করবে, এমন সময় অর্ধ উলঙ্গ দুই জেলে তাদের নৌকা নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। কাছে এসে মাথা থেকে স্ট্র হ্যাট খুলে আমাদের স্বাগত জানাল ওরা। নৌকার সামনে, গলুইয়ের কাছে, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে বিরাট একটা হাঙর। 'টিবুরোঁ!' বিড়বিড় করে বলল আমার পাশে রেলিং ধরে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা নিগ্রো মহিলা। এই মহিলা কতগুলো কিউবান বাচ্চার পরিচারিকা। হাঙরের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম আমি, তাহলে দেখা পাওয়া গেল! আমার মনোভাব হলো খনিতে

কাজ করা স্বর্ণজ্বরগ্রস্ত লোকের মতো, যে একটা সোনার টুকরো খুঁজে পেয়েছে।

হাভানার কথা যখনই আমি ভেবেছি, মনে হয়েছে ছোট্ট একটা বন্দরের কথা। সাদা বা পাহাড়ী-মাটি রঙা কাঠের ছোট ছোট বাড়ি বন্দরের রাস্তার দু'ধারে সারি দিয়ে আছে; নৌকোগুলোর মাস্তুলে রঙিন পাল বাতাসে দুলছে, রাস্তা দিয়ে ক্যাব টেনে চলেছে ঘোড়া, অর্ধ উলঙ্গ নিগ্রো মহিলারা বিশ্রাম নিচ্ছে রকিং চেয়ারে, ছোট্ট ক্যাফেগুলোতে বাজছে সুরেলা বাজনা, সেই সঙ্গে পরিবেশিত হচ্ছে সুগন্ধী মদ।

হাভানা বন্দরের পানি দেখলাম কালচে, তলা দেখা যায় না। প্রচুর হাঙর আছে। ক্যারিবীয়ানের সবচেয়ে বড় হাঙরের বেশ কয়েকটা ধরাও পড়েছে এখানে।

উইলিয়াম বলস্টার নামের এক আঠারো বছর বয়সী আমেরিকান ছুটি কাটাতে হাভানা এসেছিল। একদিন সে সিদ্ধান্তে এলো দেখবে বন্দরে হাঙর আছে কিনা। হাতের তালুর সমান বড় একটা হুকে দড়ি বেঁধে তৈরি হয়ে গেল সে, হুকে মাংস গেঁথে লাইন ফেলল পানিতে। আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল, কিছুই ঘটল না; তারপর প্রচণ্ড একটা টান পড়ল দড়িতে। পায়ে দড়ি পেঁচিয়ে গেল তার। পরমুহূর্তে টানের চোটে পানিতে গিয়ে পড়ল বলস্টার।

দু'দিন পরে কর্ক সোলের একপাটি জুতো পাওয়া গেল জেটির শেষে, পানিতে। চেনা গেল ওটা বলস্টারের। ওই একপাটি জুতো ছাড়া বেচারার আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তবে একথা বলতেই হয় যে হাভানা বন্দরের সবচেয়ে আতঙ্কজনক প্রাণী হাঙর নয়। ইচ্ছে থাকলে হাঙরকে এড়ানো যায়, কিন্তু কিউবান কাস্টম্‌স্ অফিসারদের হাত থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই।

সকাল নয়টার সময় অউরিগা ছেড়ে নেমে এসেও বিকাল পাঁচটার আগে আমরা কাস্টম্‌স্ শেড থেকে বেরতে পারলাম না।

আমি স্পষ্ট বুঝে গেলাম সময় এখানে ভিন্ন ছন্দে চলে। এমন একটা ছন্দে, যে ছন্দ আমাদের মতো ইউরোপিয়ানদের কাছে একদমই অজানা। সবচেয়ে অলস নেপল্‌স্‌বাসী যে কাজ কয়েক মিনিটে সেরে ফেলবে, সেই একই কাজ এখানে করতে লাগবে কয়েকঘণ্টার গপ্প আর লোক দেখানো কাজ সম্পাদনের চেষ্টা। তাড়াহুড়ো করার কোন প্রচেষ্টায় কোন রকমের কোন কাজ হবে না। এক আমেরিকানের কথা জানি, এখানে আসার পর প্রথম কয়েক মাস আদিবাসীদের ক্রমাগত তাড়া দিয়ে নিউ ইয়র্কের গতিময়তা বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে সে বেচারা মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

পৌঁছনোর পরদিন শীতের সূর্যালোকিত সকালে চললাম প্র্যাডোর ধার দিয়ে, যাচ্ছি গিলেস ল্যামবার্ট নামের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। এই বন্ধুটি কনস্টেলেশন পত্রিকার মধ্য- আমেরিকা বিশেষ সংবাদ-দাতা। বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে এখানে এসে পৌঁছেছে ও। এখন গুপ্তধন সন্ধানকারী একটা দলের তৎপরতার ওপর নজর রাখছে।

ক্যারিবীয়ান দ্বীপপুঞ্জ গুপ্তধন শিকারীদের কাছে দুনিয়ার সেরা। সতেরোশো শতাব্দীতে ডুবে যাওয়া স্প্যানিশ গ্যালিয়ন বা বিচারের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া মেক্সিকান যাজকদের মাটিতে পুঁতে রাখা মূল্যবান পাথর–আরও কত কি যে আজও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে তার হদিস কেউই জানে না।

ল্যামবার্ট ইদানীং বিচিত্র কিছু চরিত্রের সঙ্গে মিশছে। তাদের কয়েকজন আছে ব্যবসায়ী। কোমরে ঝুলছে ভারী রিভলভার। এরা যে বাতিস্তা পার্টির সদস্য, অস্ত্রটা তার প্রমাণ। বাতিস্তা ছিল অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট, পরে কিউবার প্রেসিডেন্ট হয়েছিল।

আজকেও ল্যামবার্টের সঙ্গে ছিল এমনই এক আজব লোক। অন্ধকারাচ্ছন্ন বারে ওকে দেখে আমার আত্মার পানি আরেকটু হলেই শুকিয়ে এসেছিল। লোকটার মাথাটা একেবারে কামানো।

ভ্রূগুলো টুথব্রাশের মতো। সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক কথা লোকটার কোন গলা নেই। গোল মাথাটা বসে আছে কাঁধের ওপরে। পেশায় সে হাঙর শিকারী। আমার জীবনে দেখা এই পেশার প্রথম লোক।

হুইস্কি গিলিয়ে পটিয়ে পাটিয়ে লোকটাকে কোজিমার দ্বীপ থেকে ধরে নিয়ে এসেছে ল্যামবার্ট আমার সুবিধে হবে ভেবে। (কোজিমার দ্বীপের মায়াময় পরিবেশেই হেমিংওয়ে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী'র পটভূমি রচনা করেছিলেন।) গরিলা সদৃশ লোকটার নাম অ্যামোস প্যারেডেজ, কিন্তু কোজিমারের সবাই ওকে ডাকে এল্ সুইযো। চার বছর আগের এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার জন্যেই এই নাম, পরে আমাকে বলেছে ও। মাছ ধরা শেষে সাগর থেকে ফিরে পারিশ্রমিক দিতে অস্বীকার করায় রেফ্রিজারেটরের এক সুইস এজেন্টকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল সুইয়ো। তবে আমাকে ও বলেছে গোটা ব্যাপারটা ছিল নতুন পন্থা আবিষ্কার। টাকার কাঙাল নয় এল সুইযো: টাকা ছাড়াই আমাকে নিয়ে খোলা সাগরে যখন খুশি বেরিয়ে পড়তে কোন আপত্তি আছে ওর? কথা শেষে অবশিষ্ট দুটো দাঁত বের করে চওড়া এক হাসি উপহার দিল সে। বলল, 'আমাকে শুধু একটা করে হুইস্কি দেবে একটা করে হাঙর ধরা পড়লে।'

পরদিন ওর সঙ্গে দেখা করার কথা সেরে সেদিনের মতো আমি বিদায় নিলাম।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এই অঞ্চলে ব্যস্ততা শুরু হয় ভোরের প্রথম আলো উঁকি দেবার আগেই। হাভানার ফুটপাথে তাদের বাক্স খুলে একশো গজ পরপর জুতো পালিশ নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ছেলের দল, ক্যাফের ওয়েইটাররা এক সেন্টের বদলে ছোট ছোট কাপে দুনিয়ার সেরা কফি সার্ভ করার জন্যে তৈরি হয়ে যায় সূর্য তার সোনালী ঝিলিকে সাগর ভাসিয়ে নেবার আগে। এই কাক ডাকা ভোরেই আমরা ফেরিতে চেপে বন্দর পেরোলাম। ওপারে একটা বাস আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে

ঝরঝরে বাসটা হেলেদুলে আমাদের নিয়ে চলল কোথায় যেন।

একঘণ্টা পর আমাদের চোখে পড়ল কোজিমার দ্বীপ–হাজার বছরের বিষণ্ণতা নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে আছে যেন জেলেদের গ্রাম। গ্রামের মাঝ দিয়ে গেছে একটা মাত্র রাস্তা। সেই রাস্তার দু'ধারে প্রজাপতি আর মথে খাওয়া বাগানের পেছনে নিচু বাড়ির সারি। আরেক দিকে এক জায়গায় অনেকগুলো ভাঙাচোরা কাঠের কেবিন, যেন ঘায়ের ওপরে জেঁকে বসেছে মাছির দল। উজ্জ্বল রং করা নৌকো চোখে পড়ল, কিন্তু কোন হোটেল দেখলাম না।

অধিবাসীরা বেশিরভাগই হাভানায় কাজ করে। সবচেয়ে গরীব হাল জেলেদের। রাত এগারোটায় তারা সাগরে যায়, নৌকোর গলুইতে মাছ নিয়ে ফেরে পরদিন ভোরে; হয়তো পায় একটা হাঙর বা তলোয়ার মাছ, কখনও দুটো; তার বেশি মাছ খুব কমই পায় ওরা। তীরে এসেই মাছ কাটাকুটি করতে লেগে যায়। পরিষ্কার দিনে পানির কিনারে তিরিশ গজ লম্বা নির্দিষ্ট একটা জায়গার বালি হয়ে ওঠে রক্তে রাঙানো।

কাছের একটা কারখানা জেলেদের মাছের কাঁচামাল কিনে ব্যবসা করে। হাঙরের ছাল থেকে বের করা হয় চামড়া, তলোয়ার মাছের চেয়ে কম দামে বাজারে বেচে দেয়া হয় মাংস। হাঙর ধরার চেয়ে তলোয়ার মাছ ধরা কঠিন। লড়াকু মাছ বলে খ্যাতি আছে তলোয়ার মাছের, সে কারণে ক্যারিবীয়ানে তলোয়ার মাছকে বলে 'এমপেরোর ফিশ'। হাঙরের পাকস্থলীতে আছে প্রচুর তেল। নাড়ীভুঁড়ি, অন্ত্র রেখে দেয়া হয় পরবর্তী দিনে আবার শিকারের আধার হিসেবে। প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে মাত্র কয়েক ডলার পায় এই জেলেরা। অনেক রাত কেটে যায় যখন একটা মাছও ঠোকর দেয় না ওদের হুকে।

বাস থেকে নেমে আমরা বালির ওপর দিয়ে হেঁটে একটা খালি কেবিনে যাচ্ছি। সপ্তাহে দশ ডলার হিসেবে আমাদের কাছে কেবিনটা ভাড়া দিতে রাজি হয়েছে জেলেরা। হাঁটতে হাঁটতে

জেলেদের সম্বন্ধে কথাগুলো বলছিল এল্ সুইযো।

কেবিনটা আর সব কেবিনের মতোই কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি। আসবাবপত্র বলতে একটা চেয়ার আর স্টীলের দুটো চৌকি। দেয়ালের পেরেকে ঝুলছে দড়ি আর জাল। এককোণে আছে নৌকোয় হাঙর তুলে আনার অতিকায় একটা হুক, লাঠির মাথায় বাঁধা। বিছানায় কোন চাদর নেই, পানির কোন ব্যবস্থা নেই, আলোর অবস্থা সীমিত; একটা ছোট কাপে রাখা তেলে ভাসছে একটা সল্‌তে। বাতাসে ভেজা, আঁশটে গন্ধ। সব মিলিয়ে পরিবেশটা এমনই হবার কথা ছিল।

সেরাতে, দশটার সময়, এল্ সুইযো আমাদের জন্যে ছোট্ট একটা জেটির শেষে অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে ছিল রোমিলিয়ো নামের আরও একজন আদিবাসী। রাতের আবহাওয়া উষ্ণ। ওর নৌকোটা বাদামের খোসার মতো ঢেউয়ের মাথায় নাচছে। আগামী এক ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রা শুরু করতে পারব আমরা।

নৌকোটা আমি খেয়াল করে দেখলাম। কোজিমারের যেসব নৌকো রাতে মাছ ধরে সেগুলোর মতোই ওটা। পনেরো ফিট লম্বা। সামনের গলুইটা ফিট তিনেক। চারজন লোক আরামে নড়েচড়ে বেড়াতে পারবে এই নৌকোয়।

রোমিলিয়োর আকৃতি ছোটখাটো হলেও চিকনচাকন দেহটা দড়ির মতো পাকানো। চুপচাপ মানুষ। চৌকো একটা লাল বেরেট হ্যাট পরায় তাকে দেখাচ্ছে কোন কার্ডিনালের মতো। ওর ডান হাতের দুটো আঙুল নেই। কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত চলে গেছে গভীর একটা ক্ষত। দু'বছর আগে একটা হাঙরকে নৌকোর পাশে তুলে এনে যখন ও গদা দিয়ে পিটিয়ে কাবু করছিল তখন দেহ মুচড়ে শেষ চেষ্টা হিসেবে ওর বাহুতে কামড়ে দেয় হাঙরটা। কনুইয়ের অর্ধেক মাংস ছিঁড়ে নিয়েছিল।

'হাঙর মারা কঠিন নয়,' আমাকে ব্যাখ্যা করে বলল রোমিলিয়ো। 'ওই হাঙরটা ছিল ছোট। হুকটা ঠিক মতোই

সেঁধিয়ে গিয়েছিল ওটার পেটে। কিন্তু হাঙর শিকার করতে গিয়ে যখন আপনার মনে হবে ওটা মরে গেছে, তখনই বেশি সতর্ক হওয়া উচিত।'

এল টিবুরোঁ পচা-মাছ খায়, কাজেই কামড়ে দিলে জায়গাটা খুব দ্রুত ঘা হয়ে পেকে ওঠে। রোমিলিয়ো আর কয়েক ঘণ্টা পর বন্দরে ফিরলেই হাতের অর্ধেকটা কেটে বাদ দিতে হতো।

পরে আমি আরও অনেক হাঙর শিকারীকে দেখেছি, প্রায় কেউই অক্ষত নয়। অ্যালভারেজ, কোজিমারের আরেক শিকারী, ওর হাতের তালু ফুটো হয়ে গিয়েছিল তলোয়ার মাছের তলোয়ারের খোঁচায়। মাছটাকে কয়েক ফিটের মধ্যে টেনে আনার পর ছুটে যায় ওটা। অবিশ্বাস্য একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। মুক্ত হয়ে সাগরের অতলে পালিয়ে যাবার বদলে তেড়ে আসে ওটা অ্যালভারেজের নৌকো লক্ষ্য করে। সেই সময় অ্যালভারেজ ঝুঁকে ছিল হালে, গান ওয়েলের নিচে হাত রেখে। মাছটা পুরো শক্তিতে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে বসে হাতের তালুর উল্টোপিঠে।

প্রায়ই এধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। একটা ঘটনা শুনেছি, এক মাঝরাতে কয়েকজন মাঝিকে আক্রমণ করে বসেছিল পাঁচ ছয়টি তলোয়ার মাছ। আরেকবার পেটে হুক বাধিয়ে তলোয়ার মাছ ধরার সময় মাছটা গুঁতো দিয়ে নৌকোর তলা ফুটো করে ফেলেছিল।

রোমিলিয়ো এঞ্জিন চালু করে সাগরের দিকে আমাদের নিয়ে চলল। অর্ধেক গতিতে চলেছি আমরা। মাছ-ধরা-এলাকায় পৌঁছনোর মিনিট খানেক আগে এল্ সুইযো দড়িদড়া পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। দড়িগুলো আঙুলের মত মোটা। শেষ মাথায় মানুষের হাতের তালুর সমান বড় একটা হুক। টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয় সাধারণ মাছ, হাঙর অথবা তলোয়ার মাছের নাড়িভুঁড়ি। সাদা রঙের একটা কাঠের ভাসমান পিপের ওপরে

জ্বলছে একটা কেরোসিন বাতি। ওটার সঙ্গে সংযুক্ত হুক-বাঁধা-দড়ি নেমে গেছে পঞ্চাশ ফ্যাদম নিচে। প্রতিটা পিপের সঙ্গে ঝুলছে এরকম ছয়টা করে দড়ি

জায়গা মতো পৌঁছতেই গতি আরও কমিয়ে দিল রোমিলিয়ো। একে একে পানিতে নামিয়ে দেয়া হলো দশটা পিপে। পিপেগুলোর মধ্যে ষাট ফিট পরপর সংযোগ রক্ষা করা হয়েছে দড়ি দিয়ে। যেখানে আমরা মাছ ধরব, সেই জায়গাটা প্রায় একশো বর্গগজ। ফুলে উঠেছে সাগর, গিলে নিয়েছে কোজিমারকে, দেখা যাচ্ছে না আর দ্বীপটাকে। দিগন্তে চোখে পড়ে হাভানার আলো।

পিপে থেকে একশো গজ দূরে নৌকোয় অবস্থান নিলাম আমরা। পিপের হারিকেনগুলো ঢেউয়ের মাথায় উঠছে নামছে, হারিয়ে যাচ্ছে চোখের আড়ালে, আবার উঠে আসছে, মিটমিট করে জ্বলছে, যেন সাগর-দানবের চোখ। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় নক্ষত্রগুলো দেখে মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। শান্ত সাগরে প্রতিফলিত হচ্ছে ওগুলোর আলো। নীরবে নৌকোয় অনড় বসে আছি আমরা। দশ সেকেন্ড পরপর জোরাল একটা টর্চের আলো ফেলে পিপেগুলো দেখছে রোমিলিয়ো। অপেক্ষা করছি আমরা, যে কোন সময় একটা হারিকেন ডুবে যাবে, বুঝতে পারব, কালো অন্ধকারে হুকে ঠোকর দিয়েছে বড় কোন মাছ। একবার বুঝে উঠলেই আমাদের একমাত্র কর্তব্য হবে কোন্ দড়ির লণ্ঠন ডুবেছে বুঝে নিয়ে দড়িতে টান দেয়া।

দু'ঘণ্টা আমরা অপেক্ষা করলাম, কিছুই ঘটল না। ফুলে ওঠা সাগরের টানে পিছাচ্ছে আমাদের নৌকো। রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা হাতে তৈরি হয়ে আছে ল্যামবার্ট। রোমিলিয়ো ঝুঁকে আছে হাতে তলোয়ার মাছের একটা পচা মাথা নিয়ে। গদা দিয়ে মাথাটায় আস্তে আস্তে বাড়ি দিচ্ছে সে, রক্ত আর পচা মাংস ঝরিয়ে ফেলছে হাঙরকে আকৃষ্ট করার জন্যে। কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না, এখনও

সার্চলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে পিপেগুলো রয়েছে আগেরই মতো।

বালতিতে পচা মাথাটা ফেলল রোমিলিয়ো। হুইস্কির বোতল খুলল এল্ সুইযো। ল্যামবার্ট আরেকটা ড্রামামিল ট্যাবলেট খেল বমি ঠেকানোর জন্যে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি আমরা, আসবে হাঙর...

আরও একটা সুদীর্ঘ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল অতি ধীরে। তারপর হঠাৎই, নৌকোর খুব কাছে, কি যেন একটা সড়াৎ করে চলে গেল রূপালী ঝিলিক তুলে। এল্ সুইযোর গলা দিয়ে তৃপ্তির আওয়াজ বেরল। রূপালী ঝিলিকের অর্থ– আমাদের রাতটা মাটি হবে না। হাঙর বা মার্লিন পাশ দিয়ে যাওয়াতে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ছোট ছোট ফসফোরেসেন্ট প্রাণীগুলো বিচলিত হয়েছে। জেলেরা এই আলোময়তা দেখলেই বোঝে এবার টোপ গেলার প্রবল সম্ভাবনা, বড় কোন শিকার টোপের দড়ির কাছে এসেছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে দড়ির মাঝে।

মিথ্যে নয় ওদের ধারণা। ঠিক তাই ঘটল। দশ সেকেন্ড পরে একটা বাতি ডুবে গেল হঠাৎ। ঝুঁকে পড়ে রোমিলিয়ো ছয়টা দড়ির মাঝ থেকে খুঁজে বের করল কোন্‌টাতে মাছ আটকেছে। দড়িটা ধরে কয়েক দফা হ্যাঁচকা টান দিল ও। টোপ গিলে নেবার যথেষ্ট সময় পেয়েছে মাছটা। এতক্ষণে হুকটা নিশ্চয়ই আটকে গেছে ওটার পেটের ভেতরে।

দড়িতে টান দিল রোমিলিয়ো, ইঞ্চি ইঞ্চি করে তুলে আনল দানবটাকে। ওর বাহুর পেশি লক্ষ করলাম আমি। দেখলাম দড়ির মতোই পাকিয়ে গেছে ওর পেশি। মনে হলো অতিকায় কোন মাছ। কিন্তু ফসফোরেসেন্ট ফেনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাছটা যখন উঠে এলো, দেখলাম খুব বেশি হলে হাঙরটা তিন ফিটের একটু বেশি হবে।

'একেবারেই বাচ্চা,' বোতে ওটাকে বাঁধার পর মন্তব্য করল

এল্ সুইযো। পাছড়া-পাছড়ি করেনি মাছটা। বড় কোন মাছ হলে কখনও কখনও নৌকো কয়েকশো গজ টেনে নিয়ে যায়, হ্যাঁচকা টানে মাঝে মধ্যে পানিতেও ফেলে দেয় মাঝিদের।

রাত দুটোর দিকে হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে এলো সাগরের আবহাওয়া। এল্ সুইযোর দেয়া কম্বলে গা মুড়ে নিলাম আমরা। রোমিলিয়ো ছোট্ট এক ঘুম দেবার জন্যে শুয়ে পড়ল।

তখনও ঘুমিয়ে পড়েনি ও, হঠাৎ দুটো বাতি একই সঙ্গে ডুবে গেল। এক সেকেন্ডও দেরি না করে এঞ্জিন চালু করে দিয়ে ঢেউয়ের মাথায় চেপে নৌকো নিয়ে এগিয়ে চলল রোমিলিয়ো।

এবারে বড় মাছ টোপ গিলেছে। একটা বাতি পানির কয়েক ফ্যাদম নিচে তলিয়ে গেল। নৌকোর খোলে পা বাধিয়ে লাইন আঁকড়ে ধরে দাঁড়াল আমাদের দুই মাঝি। ছয় ফিট একটা হাঙরকে তুলে এনে গদা দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলল রোমিলিয়ো, কিন্তু এল্ সুইযো মাত্র কয়েক গজ দড়ি নিজের দিকে টেনে আনতে পেরেছে। দড়ির আরেক প্রান্তে বিশাল মাছটা প্রচণ্ড তাণ্ডব তুলেছে ছুটে যাবার জন্যে। আরও দু'এক গজ দড়ি গোটাতে পারল সুইযো, কিন্তু সে মাত্র মুহূর্তের জন্যে। আবার দড়ি টেনে সাগরের গভীরে তলিয়ে গেল মাছটা।

কখনও কখনও দড়ি স্থির রাখতে পারছে সুইযো। মাছটা চাইছে তলিয়ে যেতে, আর সুইযো দড়িতে কোন ছাড় দিতে নারাজ। দুই পক্ষই নিজেদের জেদ বজায় রাখল। সাগরে মোচড় মারছে দড়িটা, আরেকটু টান বাড়লেই পট করে ছিঁড়ে যাবে; হ্যাঁচকা একটা টানই যথেষ্ট, কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মাছটা। পনেরো মিনিট পরে এল্ সুইযো অনুভব করল জিতে গেছে ও। আগের মতো আর বাধা দিচ্ছে না মাছটা, একটু একটু করে উঠে আসছে ওপরে।

প্রতি গজ টেনে আনতে দেহের পুরো শক্তি ব্যবহার করতে হচ্ছে এল্ সুইযোকে। মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে ওর। এই শীতের

রাতেও ঘামছে দরদর করে। কিন্তু তবুও তৃপ্তির একটা ছাপ আছে ওর চেহারায়, পেরেছে ও, জিতে গেছে প্রায়। নৌকোয় দ্রুত জড় হচ্ছে দড়ি। আমাদের দশ ফিট সামনে কালো একটা আবছা অবয়ব দেখতে পেলাম। শেষ টান খেয়ে পানির ওপরে মাথা জাগাল একটা বড় হাঙর। দেখে মনে হলো মৃতপ্রায়, নড়ছে না তেমন। আমি ঝুঁকে দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু রোমিলিয়ো টেনে সরিয়ে আনল। তড়পাতে শুরু করেছে হাঙরটা। মুক্তির শেষ চেষ্টায় কালো পানিতে লেজ আছড়ে বড় বড় ঢেউ তৈরি করছে। প্রবল ভাবে দুলছে নৌকোটা। পানির ঝাপটায় ভিজে গেলাম আমরা। পেটের বদলে হাঙরটার চোয়ালে আটকেছে হুক। বুঝতে পারলাম ওটার দুর্বল হতে এত সময় লেগেছে কেন। চোয়াল খুলে আবার বন্ধ করল ওটা। আওয়াজ শুনে মনে হলো ভিজে রেশমি কাপড়ে বাড়ি খেল কোন উড়ন্ত বাদুড়। শেষ কয়েক গজ দড়ি পাক খাবার সময় গায়ে জড়িয়ে নিল হাঙরটা।

পাক খাওয়ার পুরোটা সময় দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকল এল্ সুইযো, তারপর হাঙরটাকে টেনে আনল নৌকোর পাশে। রোমিলিয়ো বড় একটা গদা তুলে নিয়ে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগল হাঙরটার মাথায়। একটু পরে লম্বা সুঁচোলো একটা লোহার দণ্ড ঢোকাল ওটার পেটে। অবশেষে জানোয়ারটা মারা যাবার পরে বসল এল্ সুইযো, হাতে তখনও ধরা রয়েছে আঙুল সমান মোটা দড়ি; তাকাল আমার দিকে। স্পষ্ট বুঝলাম ওর চোখের দৃষ্টিতে মেশানো প্রশ্নটা। নীরবে হুইস্কির বোতল তুলে ওর হাতে ধরিয়ে দিলাম আমি।

দুই

বিকেলে যখন সাগরে গেলাম না, কোজিমারের ক্যাফে থেকে ক্যাফেতে ঘুরে বেড়ালাম আমরা, গল্প করলাম জেলেদের সঙ্গে। কখনও দেখলাম ওদের কয়েকজন ছোট্ট কাঠের জেটির শেষ প্রান্তে সুতো দিয়ে মাছ ধরছে। পাঁচ-ছয় পাউন্ড ওজনের মাছ পাওয়া যায় কাছের পানিতে। টোপ হিসেবে বড়শিতে সার্ডিন গেঁথে পায়ের কাছে নামিয়ে দেয় ওরা। হঠাৎ যখন দড়িতে হ্যাঁচকা টান পড়ে, মাঠে মারা যায় ওদের দক্ষতা। বড়শি, সুতো, সীসে আর সার্ডিন সাগরের গভীরে তলিয়ে যায়। তখন উঠে দাঁড়িয়ে হাত মুঠো করে গালাগাল করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না ওদের; ততক্ষণে এক ডলার দামের নাইলন নিয়ে পালিয়েছে হতচ্ছাড়া হাঙর। কোন কোন দিন তীরের দশ গজের মধ্যে চলে আসে হাঙরের দল। গ্রাম থেকে একটু দূরে পঞ্চাশ ফ্যাদম গভীর এক গর্তের ওপরে ঝুঁকে আছে একটা মস্ত পাথর, সাগর ওখানে সব সময়ে সবুজ; পানি দেখে মনে হয় যেন আর সব জায়গার তুলনায় ঘন। জেলেরা একবাক্যে বলে, বড় হাঙরগুলো ওখানে আছে।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে কয়েকটা বাচ্চা ওই পাথরটার ওপরে খেলছিল। হঠাৎ একটা বাচ্চা পড়ে যায় নিচে। প্রবল ঘুরপাক সৃষ্টি হয় ওকে ঘিরে, তারপরই সাগরের আলোড়িত পানি লাল হয়ে ওঠে রক্তে। 'বাচ্চাকে হাঙর টুকরো টুকরো করেছে, এই চিন্তাটা কুরে কুরে খাচ্ছিল ওর বাবাকে,' বলল এল্ সুইযো।

'মানুষটা পাগল হয়ে গিয়েছিল।' কয়েক সপ্তাহ কোজিমারের এখানে ওখানে উন্মাদের মতো ঘুরল বেচারা। লোকজন দয়া করে ওকে যা দিত তাই খেয়ে বেঁচে ছিল। মাছ ধরা একেবারে ছেড়েই দিল। মাঝে মাঝে গিয়ে সেই বিপজ্জনক পাথরের ওপরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত। 'একরাতে বিস্ফোরণের আওয়াজে নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। কি হয়েছে দেখতে কেউ একজন গেল সেই পাথরের কাছে; দেখল বাচ্চার দুঃখে উন্মাদপ্রায় মানুষটা সাগরের যে জায়গায় তার বাচ্চা ডুবেছিল, সেখানে একের পর এক ডিনামাইটের স্টিক ছুঁড়ছে। এর কয়েকদিন পরেই লোকটা কোজিমার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। নিজেও কি সে পাথর থেকে নিচে লাফ দিয়েছিল? আমরা তা জানি না। তাকে আর কখনও দেখা যায়নি। কিন্তু এঘটনার পর আর কেউ মাছ ধরেনি ওখানে।'

কোজিমারের ক্যাফে থেকে ক্যাফেতে ঘোরার সময় এক বিকেলে পরিচয় হলো মিগুয়েল রেমিরেজের সঙ্গে। রেমিরেজের বক্তব্য, সে-ই আসলে হেমিংওয়ের দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সীর দি ওল্ড ম্যান। 'মিস্টার ওয়ে যে মার্লিন ধরার কথা লিখেছিলেন,' বলল রেমিরেজ, (লেখককে নাকি ওয়ে নামেই ডাকত সে।) 'আমিই সেই লোক। মিস্টার ওয়ের সঙ্গে ভাল পরিচয় আছে আমার। তাঁকে আমার জীবন-কাহিনী শুনিয়েছি অনেকদিন।' সত্যিই রেমিরেজের সঙ্গে হেমিংওয়ের সেই বুড়ো জেলের আশ্চর্য মিল আছে, সেই একই চেহারা আর শরীরের আকৃতি।

প্রথম যখন ওকে দেখলাম, একা বসে ছিল সে আমাদের থেকে কয়েক গজ দূরে আরেকটা টেবিলে। গ্লাসের পর গ্লাস মদ সাবাড় করছিল, চোখে ছিল হারানো দিনের মায়াবী স্বপ্ন। অত মদ যে গিলছে, ওর শরীরে আঁটছে কি করে, ভেবে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম। ব্যাপারটা রহস্যময় লাগছিল, কারণ বুড়ো লোকটার শরীর ছোটখাটো: এতই শুকনো, যে সেখানে কোন জলীয় পদার্থ

আছে বলে মনেই হয় না। গাল আর গলার চামড়া রোদে পোড়া, হাজারটা ভাঁজ; দেখলে শুকিয়ে যাওয়া পুকুর তলার রোদে চিরচির হওয়া কাদার কথা মনে পড়ে। আমাদের আমেরিকান ভেবে প্রথমে ও সহজ হতে পারেনি। 'মিস্টার ওয়ের' সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় তার মাঝে আমেরিকানদের প্রতি তেমন কোন উষ্ণ প্রীতি আমি দেখিনি।

'তাঁকে যখন প্রথম দেখি,' বলল রেমিরেজ, 'তীর থেকে মাইল খানেক দূরে ছোট মাছ ধরছিলাম আমি। একটা নৌকো করে এলেন মিস্টার ওয়ে; হাতে ছিল একটা ক্যামেরা, আমার ছবি তুলতে চেয়েছিলেন। তারপর একটা ক্যাফেতে যাই আমরা, দু'জনে মিলে সাবড়ে দিই এক বোতল হুইস্কি। কয়েক ঘণ্টা সেখানে মাছ ধরা নিয়ে কথা শোনেন মিস্টার ওয়ে। আমি যখন সেই মাছটার কথা বললাম, কি যেন তিনি লিখে নিলেন তাঁর নোটবুকে। আমাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন নতুন একটা নৌকো আর কয়েকটা কাপড় কিনে দেবেন।'

কোজিমারের সৈকতে আমরা যে কুঁড়েটা ভাড়া নিয়েছি, তার থেকে একটু দূরেই রেমিরেজের কুঁড়ে। অন্যগুলোর তুলনায় তারটায় কোন দিক থেকেই আরাম আয়েসের বাড়তি ব্যবস্থা নেই। ওর কুঁড়েতে ঢুকে যেন হেমিংওয়ের বইতে প্রবেশ করলাম। দেয়াল থেকে ঝুলছে জাল; মেঝেতে অজস্র খবরের কাগজ, যেখানে দি ওল্ড ম্যান ঘুমাত।

কোজিমারের আর সব জেলের মতোই মাত্র কয়েক ডলার ওর রোজগার। আমাকে ও বলেছে গ্রামে ভাল একটা বাড়ি আছে ওর, কিন্তু সেখানে ওর ডজনখানেক ছেলে আর নাতি-নাতকুড় বাস করে। সাগরের তীরে তক্তার চার দেয়ালের মাঝে, যেখানে পাওয়া যায় লোনা-জল আর সৈকতের বালির গন্ধ, ভোরে জেগে উঠতে হয় বাড়ি ফেরা জেলেদের হৈ-হল্লায়, সেখানেই থাকতে ভালবাসে ও। নিজে এখন আর মাছ ধরে না রেমিরেজ। সাতষট্টি বছর বয়স

হয়েছে ওর, এখন অন্য জেলেদের নৌকো মেরামতের মাধ্যমে রোজগার করে।

একবার ওর বিশ্বাস অর্জন করার পর আমাদের ছেড়ে আর কোথাও গেল না রেমিরেজ। হয়তো ওর মনে আশা জাগল আমরা ওকে একটা নৌকো কিনে দেব। আমরা ফ্রেঞ্চ সেজন্যে আমাদের সঙ্গে ওর খাতির হয়ে গেল, ব্যাপারটা তা নয়; কারণ ও এমনকি জানে না পর্যন্ত ফ্রান্স কোথায়। শহরের লোক বাদ দিলে কিউবার প্রায় আর সবাই আমাদেরকে রাস্তা-ঘাটে থামিয়ে জানতে চায় আমরা কোন্ ভাষায় কথা বলছি। রেমিরেজও তার ব্যতিক্রম নয়। যখন আমরা বলি যে ফ্রেঞ্চ ভাষা, ও বলে, 'ও, তাই ভাবছিলাম।' আসলে কিছুই ভাবছিল না ওরা, জানেও না নিজেদের ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা, তবে সেকথা বলতে নারাজ।

প্রতি সকালে রাতের মাছ ধরার বিবরণ জানাতে আমাদের কুঁড়েতে চলে আসে রেমিরেজ। রোমিলিয়োর কপাল মন্দ, মাছ পায়নি। এল্ সুইযো পাঁচশো পাউন্ড ওজনের সেই সোর্ডফিশটা ধরার খুশিতে এখনও পাঁড় মাতাল হয়ে পড়ে আছে। ইত্যাদি। একদিন দেখলাম সৈকতে পোরটুয়োনডো নামের এক জেলের সঙ্গে কথা বলছে রেমিরেজ। সাগরের দিকে আঙুল তুলে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কি যেন বলছে পোরটুয়োনডো। অবাক একটা কাণ্ড ঘটেছে আজকে।

ভোরে যখন পোরটুয়োনডো বন্দরে ফিরছিল, দেখল বিরাট একটা হাঙর জলের তিন ফিট নিচে মোচড় খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাঙর সচরাচর ওই সময় ওই জায়গায় আসে না। সরে যাওয়ার বদলে কৌতূহল দেখিয়ে কাছে, তিন ফিটের মধ্যে চলে এলো হাঙরটা; বিস্মিত হলো অপ্রস্তুত পোরটুয়োনডো। ওর দড়িগুলো গোটানো ছিল নৌকোয়। একটা দড়ি ফেলার যথেষ্ট সময় পেল পোরটুয়োনডো। এরপর ঘটল সেই আশ্চর্য ঘটনা।

টোপের দিকে ছুটে যাবার বদলে টোপ ঘিরে এক নাগাড়ে

চক্কর মেরে সাঁতার কেটে চলল হাঙর। তারপর নৌকোর তলায় এসে এত জোরে গুঁতো দিল যে ভয়ানক ভাবে দুলে উঠল নৌকো। আরেকটু হলেই ভারসাম্য হারিয়ে পানিতে পড়ে যেত পোরটুয়োনডো। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল ও, দেখল ছয় ফিট দূরে পানিতে ভাসছে দানবটা। লেজ আছড়াচ্ছে অল্প অল্প।

দ্বিতীয় একটা দড়ি আবার পানিতে ফেলল পোরটুয়োনডো, কিন্তু কোন ফল হলো না। বারবার ভয়ঙ্কর চোয়াল খুলল আর বন্ধ করল হাঙরটা, তারপর আবার চক্কর কাটতে লাগল নৌকোটাকে ঘিরে। টোপ গিলল না; অলক্ষুণে কিছু একটা আছে ওটার আচরণে।

'দেখে যতদূর বুঝেছি, কমপক্ষে বারো ফিট লম্বা হবে ওটা,' রেমিরেজকে বলল পোরটুয়োনডো। 'কোন হাঙর আমার নৌকোটাকে ডুবিয়ে দিতে পারবে না; তবুও আমি ভয় পেয়ে গেলাম। পৈশাচিক কি যেন একটা ছিল ওই খুদে শীতল চোখে। যেন টিটকারির হাসি হাসছে। এঞ্জিন চালু করে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি আমি।'

সেদিন কোজিমারের লোকজনের মুখে মুখে ফিরল পোরটুয়োনডোর হাঙরের কাহিনী। ভীতু খরগোশের মতো আচরণ করেছে পোরটুয়োনডো। ওই আকারের একটা মাছ বেচে কমপক্ষে তিরিশ ডলার রোজগার করা যেত। যেভাবে ওটা যেচে এসে দিনের আলোয় ধরা দিয়েছিল—সূর্য ওপরেও তেমন একটা ছিল না যে রোদের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে যাবে—ওর উচিত ছিল যে করে হোক হাঙরটাকে নৌকোয় তুলে আনা। প্রতি নৌকোতেই একটা বা দুটো লোহার দণ্ড থাকে যেগুলো দিয়ে মুগুর-পেটার পর মাছ বেঁচে থাকলে শরীর ফুটো করে দেয়া হয়। মারা পড়ে হাঙর বা সোর্ডফিশের মতো বড় মাছও। ওই দণ্ড ঠিক মতো ছুঁড়ে দিতে পারলেও দানবটার দফারফা হয়ে যেত। তার বদলে কিনা এঞ্জিন চালু করে দিয়ে ভেগে এলো লোকটা! সতীর্থদের চোখে পরবর্তী

কয়েক ঘণ্টায় অনেক ছোট হয়ে গেল পোরটুয়োনডো।

কাহিনীর এখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু কয়েকদিন পরে সাগরের ওই একই এলাকায় আরেকজন জেলে পোরটুয়োনডোর সেই হাঙরের মতো একটা হাঙর দেখল। সে-ও চেষ্টা করল ওটাকে টোপ গেলাবার। না পেরে হারপুন দিয়ে গাঁথতে চাইল। লাগল না, জানোয়ারটার মাথা থেকে ইঞ্চিখানেক সামনে পড়ে অস্ত্রটা তলিয়ে গেল পানিতে। একবারও নড়ল না হাঙরটা। সেই সপ্তাহে ওটাকে দেখা গেল আরও তিন-চারবার, কিন্তু ব্যর্থ হলো ওটাকে ধরার সব রকম প্রচেষ্টা। রাতের শিকার শেষে ফেরার পথে হাঙরটা যেখানে দেখা দেয়, সেখানে যেতে শুরু করল জেলেরা। সবাই বিস্মিত; এর আগে আর কোন হাঙরকে টোপ গিলতে আপত্তি করতে দেখেনি কেউ। অনেকের মনে ধারণা জন্মাল ওটা মায়াবী হাঙর। তবে সবচেয়ে বড় কথা, গর্বে আঘাত লাগল জেলেদের। তারপর এক রবিবার, সবাই যখন সাধারণত বন্দরের ক্যাফেতে তাশ পেটানোয় ব্যস্ত থাকে, সেই সময়ে একই সঙ্গে প্রায় পনেরোজন জেলে সাগরে বেরিয়ে পড়ল; একশোটা দড়ি ছড়িয়ে দিল হাঙরটাকে ধরার আশায়। তীর থেকে জায়গাটা এত কাছে যে ভাল শিকারের আশা তাদের ছিল না, কিন্তু তবু ছয়টা মাছ ধরা পড়ল। সবচেয়ে বড়টার ওজন সাড়ে সাতশো পাউন্ড। পোরটুয়োনডো বলল ওটাকে সে চিনতে পেরেছে। কিন্তু হাঙর দেখতে সব একই রকম; আসলেই কি ধরা পড়েছে সেই ব্যতিক্রমী হাঙর? জেলেরা সিদ্ধান্তে এলো, এটাই সেটা। হাঙরটাকে যখন তীরে নিয়ে আসা হলো, গোটা গ্রাম ভেঙে পড়ল ওটাকে দেখতে। রবিবার কারখানা বন্ধ থাকে, কাজেই পরদিনের আগে হাঙরটাকে কাটা যাবে না। পরদিন অ্যালভারেজ হাঙরটার পেট চিরল ছুরি দিয়ে। ভেতরে পাওয়া গেল অস্বাভাবিক শিকার। মানব দেহ। মানব শিশুর দেহ।

এবার দায়িত্ব নিল পুলিশ। হাভানা থেকে এক সার্জনকে সঙ্গে

নিয়ে এলো এক পুলিশ অফিসার। ঠিক কবে বাচ্চাটা মারা পড়েছে সেটা বলা খুবই দুরূহ কাজ, এমনকি কিউবান পুলিশ সার্জনের পক্ষেও। বিরক্ত চেহারায় বিকৃত লাশের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল সে। এক পলক দেখেই বলে দেয়া যায় শিশুটির বয়স তিন-চার মাসের বেশি হবে না। মৃত্যু ঘটেছে বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা আগে, জানাল সার্জন। কেউ ফেলে দিয়েছিল বাচ্চাটাকে হাঙরের মুখে? দুর্ঘটনা? নিঃসন্দেহে দুস্কৃতকারীর কাজ, ফেলে দিয়ে খুন করেছে কেউ, নইলে অতটুকু বাচ্চা সাগরে যেতে পারত না। অপরাধী রয়ে গেল ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই তদন্তে একটাই উপকার হলো; কদিনের জন্যে বিষণ্নতা আর নির্জীব ভাব ঝেড়ে ফেলে মাথা খাটাতে লাগল সবাই, গুজবে মত্ত হয়ে গেল।

এই প্রথম যে কোজিমারে হাঙর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো তা নয়। কয়েক বছর আগে সান্তিয়েগো দ্য কিউবাতে, খুন করে হাঙরের মুখে লাশ ফেলার অপরাধে, অ্যামিনেজ নামের এক লোককে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল ওটা সাধারণ দুর্ঘটনা। ক্যারিবীয়ানের খুনীরা যে খুন করার পর দেহটা মাটিতে না পুঁতে বা আগুনে না পুড়িয়ে হাঙরকে দিয়ে লাশ খাওয়ানোই সহজ বলে মনে করে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

সান্তিয়েগো কেসের সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় ছিল সাফল্য অর্জনে খুনীর আন্তরিক প্রচেষ্টা। বিরক্তিকর এক সহযোগীকে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে। খুন করাটা কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু দেহটা? ঠিক করল সাগরে ফেলে দেবে হাঙরের খাবার হওয়ার জন্যে। কিন্তু হাঙর আশেপাশে না থাকলে তাতেও অনিশ্চয়তা আছে। কাজেই সে নিশ্চিত হয়ে নিল যাতে হাঙরের দল ধারেকাছেই থাকে। অ্যামিনেজের একটা বাড়ি ছিল বন্দরের কাছে। পানির ওপরে বাড়িটার ঝুল বারান্দা জেটির মতো বেরিয়ে ছিল। এই জেটি থেকে পরপর চোদ্দ দিন সে পানিতে মাংস

ফেলল। নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট জায়গায় গেলে খাবার পাওয়া যায়, এধরনের খবর হাঙরের দুনিয়ায় দ্রুত ছড়ায়। শিগ্‌গিরই বড় দু'তিনটে হাঙর নিয়মিত আসতে লাগল, চক্কর কেটে ঘুরতে লাগল বারান্দার পিলারের মাঝ দিয়ে। লোকটাকে জাপটে ধরে রেলিঙের ওপর তুলে নিচে ছুঁড়ে দেয়া ছাড়া বলতে গেলে আর কিছুই করতে হয়নি অ্যামিনেজকে।

অনুশোচনায় মূহ্যমান হয়ে না গেলে কোনদিনই ওর ওপরে পুলিশের সন্দেহ এসে পড়ত না। একদিন আর সইতে না পেরে সে নিজেই ধরা দিল পুলিশের হাতে; স্বীকার করল অপরাধ।

পোরটুয়োনডোর হাঙর যখন ধরা পড়ল, কোজিমারে আমাদের উপস্থিতির তখন তিন সপ্তাহ চলছে। ততদিনে পরিচিত হয়ে গেছি আমরা। ফলে এক গ্লাস হুইস্কির দাম কমে তিরিশ সেন্টাভোতে নেমে এসেছে। তার মানে হচ্ছে, আদিবাসীরা আমাদের আর আমেরিকান ভাবছে না। আমরা যে বিচ্ছিরি বিছানায় ঘুমাই এবং ভাঙা কুঁড়ের কোন বদনাম করি না, এটা বোধহয় ওদের এই বিশেষ বিবেচনার কারণ। বিছানাটা তেমন খারাপ ছিল না। পরে নিকারাগুয়ায় গিয়ে এরচেয়ে খারাপ বিছানায় শুতে হয়েছে আমাকে। বিছানা নয়, সমস্যা করেছে খাবার। আমরা খাচ্ছি সোর্ডফিশ, হাঙর, প্লেট ভর্তি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় শাকসব্জি; বিশেষ করে ইউক্কা। কিউবানদের, সে তারা গ্রামের হোক বা শহরের, অতি প্রিয় খাবার ইউকা। ইউক্কা খেতে লাগে স্রেফ বিস্কুটের টিনের কাগজের মতো। মাংস খেয়েছি মাছির সঙ্গে ভাগ করে, কারণ মাংস রোস্ট করে কোজিমারের খাবারের দোকানে খোলা অবস্থায় রাখা হয় সারাদিন। চাইলে ওই মাংসই সার্ভ করে ওয়েটাররা। খাবারের দোকানগুলোর বেশিরভাগই কাঠের সাধারণ কুঁড়ে। ওগুলোতে শুধু খাবারই বিক্রি হয় না, পাওয়া যায় নিক্-ন্যাক্স, কালো তামাকের তৈরি কিউবার সিগারেট, মিষ্টি কাগজ, তাস আর মোজা। খাবার যেহেতু রাঁধা হয় একই জায়গায়, তাই সব

কিছুর ওপরেই পড়ে ধোঁয়া আর তেলের ছোপ; জিনিসগুলো যতদিন টেকে, কিছুতেই গা থেকে দূর করা যায় না ঠাণ্ডা মাংসের চপের গন্ধ।

খারাপ আবহাওয়ার কারণে যখন সাগরে যেতে পারলাম না, জেলেদের সঙ্গে পোকার খেলে সময় কাটালাম আমরা। কখনও কখনও টাকা থাকে না ওদের কাছে; তখন ভবিষ্যতে যে মাছ ধরবে, সেটা বাজি রেখে চলে খেলা। কম স্টেকের খেলায় হাঙর-প্রতি-কেজি-দামে বাজি ধরা হয়, আর সোর্ডফিশের দাম যেহেতু চড়া, তাই বেশি স্টেকের খেলার সময় বাজি ধরে সোর্ডফিশ দিয়ে। খেলোয়াড়রা ছোট, ময়লা কাগজে তাদের দেনা-পাওনা লিখে রাখে; দেখলে মনে হয় গৃহিনীর বাজারের লিস্টি।

এরকম এক সন্ধেতেই আমরা প্রথম লুই জাগলোর কথা শুনলাম। একত্রিশ বছর বয়সী এক জেলে ও। উদগ্রীব লোক; নাকটা থরথর করে কেঁপে ওঠে হাতে ভাল তাস এলেই; সেকারণে ওর ডাকনাম দেয়া হয়েছে খরগোশ। এক রাতে কপাল খারাপ থাকায় নৌকো বাজি ধরতে বাধ্য হলো জাগলো। পরে বোঝা গেল জীবনে এত ভাল কাজ আর কখনও করেনি সে।

আরগুডিন, তাসে জিতে জাগলোর নৌকোয় অংশীদার হয়ে বসা সেই লোকটি, দেখা গেল ওর ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছে। ডোরাও নামের ছোট এক জাতের মাছ ধরায় অতি দক্ষ লোক এই আরগুডিন। কয়েক পাউন্ড ওজনের এই মাছগুলো বেচত ওরা কোজিমারের বাজারে।

রাতে হাঙর শিকার করে জাগলো, আর দিনে ডোরাও ধরে আরগুডিন। দু'জনে লাভ ভাগাভাগি করে নেয় ওরা। সোনায় সোহাগা হয়েছে ওদের পার্টনারশিপ। একদিন খুব উত্তেজিত হয়ে বন্দরে ফিরল জাগলো। তীর থেকে মাত্র কয়েক রশি দূরত্বে একটা বিধ্বস্ত ইয়ট দেখেছে ও। প্রচণ্ড টর্নেডোয় ডুবে গিয়েছিল ইয়ট; এখন পানির ধাক্কায় চলে এসেছে তীরের কাছে; নীল পানিতে

পরিষ্কার দেখা যায়, পড়ে আছে মাত্র সাত ফ্যাদম নিচে, সাগরের বুকে। আরগুডিন আর জাগলো মিলে হাভানায় গিয়ে একজন ডুবুরী নিয়ে এলো। সঙ্গে এলো বাতিস্তা সরকারের এক প্রতিনিধি। সাগরের আইন অনুযায়ী বিধ্বস্ত নৌযান যে প্রথম দখল করে ওটা তারই। কিউবান সরকার ধন-সম্পদের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে নেয়। ধন-সম্পদের দাম কত সেটাও তারাই নির্ধারণ করে। বাতিস্তার লোক জড়িত থাকে প্রতি পদক্ষেপে।

হাঙর যাতে আক্রমণ করতে না পারে সেজন্যে একটা ধাতব খাঁচায় করে নিচে নামল ডুবুরী। পরবর্তী দু'সপ্তাহ ধরে সাগর-তল থেকে বিধ্বস্ত নৌযানের প্রতিটি টুকরো তুলে আনল সে। সব মিলিয়ে জিনিসগুলোর মূল্য ধার্য করা হলো ছয় হাজার ডলার। উদ্ধারকৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যটি হচ্ছে এক সেট গহনা। একটা ড্রয়ারে ছিল; শুধু ওটার দামই চার-পাঁচ হাজার ডলার। কয়েক মাস পরে, মাছ ধরা ছেড়ে কিউবার অভিজাত এলাকা ভ্যারাডেরোতে চমৎকার দুটো বাড়ি কিনল আরগুডিন ও জাগলো। টাকা কোথায় পেয়েছে জিজ্ঞেস করতে জানাল জুয়া খেলে জিতেছে।

কিন্তু ওদের এই হঠাৎ বড়লোক হওয়া নিয়ে কোজিমারের জেলেদের কাছে আরেকটা ব্যাখ্যা আছে—ওরা বলে, বিধ্বস্ত ইয়টে নিজেরা ডুব দিয়েছিল আরগুডিন আর খরগোশ; ডুবুরী আনার আগে।

পোকার খেলা শেষে খেলোয়াড়দের বলা গল্পগুলোর মধ্যে এটাও একটা। অন্য গল্পগুলোও কম চাঞ্চল্যকর নয়। যুদ্ধের কয়েক বছর আগে, আমাদের বলেছে রোমিলিয়ো—ও ছিল প্যাটসি বার্ট নামের এক স্কিন ডাইভারের সহযোগী। প্যাটসি বার্ট বিমানে করে কোজিমারে এসেছিল হাঙরের ছবি তুলতে। তাকে পাঠিয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ার এক বিজ্ঞাপনী সংস্থা; নতুন কীটনাশক বাজারে ছাড়ার আগের বিজ্ঞাপনে হাঙরের চলচিত্র

ব্যবহার করতে। প্যাটসি বার্টই রোমিলিয়োকে কার্ডিনালের মতো বেরেট টুপি পরতে শিখিয়েছে।

হাঙর কেন? বিজ্ঞাপনী সংস্থার ব্যবস্থাপকের মাথা থেকে বেরিয়েছে এই পরিকল্পনা। বড় একটা হাঙর হঠাৎ বাঁক নিচ্ছে, এই ছবি তুলতে হবে বার্টকে। টেলিভিশনে দেখানোর সময় পাশে ক্যাপশন যাবে এমনকি হাঙরও কীটনাশক 'এক্স'কে সমঝে চলে, বা এধরনের কিছু।

দৃশ্যটা কোন অ্যাকুইরিয়ামে ধারণ করলেই ভাল হতো, কিন্তু বার্ট নিজে প্রায় জোর করেই কিউবাতে এসেছে চমকপ্রদ ছবি পাবার আশায়। তাছাড়া ওর বড় একটা সখও পূরণ হবে, অতিকায় দানবদের মাঝে ডুব-সাঁতার দিয়ে বেড়াতে পারবে। এই সখ পূরণ করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই একটা পায়ের প্রায় অর্ধেক মাংস হারিয়েছে ও। অস্ত্রোপচার সফল হয়েছিল, ফলে পায়ে কোন জড়তা দেখা দেয়নি তার। আগেও অন্তত একশো বার হাঙরের মুখোমুখি হয়েছে বার্ট। অন্য স্কিন ডাইভারদের মতো কৌশলও ব্যবহার করে না সে, হাঙরকে ভয় পাইয়ে তাড়াবার জন্যে চেঁচায় না পানির তলায়।

'সবাইকে পালাতে দেখতে অভ্যস্ত হাঙর,' বলেছে বার্ট, 'কেউ সাহস করে এগোলে দিশে হারিয়ে পালায়।'

'ও আমাকে আরও বলেছিল হাঙর সচরাচর মানুষকে আক্রমণ করে না,' যোগ করল রোমিলিয়ো। 'জবাবে আমি বলেছিলাম, যাদের হাঙর আক্রমণ করে, তারা সচরাচর তা বলার জন্যে ফিরে আসে না।

'বউকে সঙ্গে নিয়ে কোজিমারে এসেছিল বার্ট। মহিলা সুন্দরী হলেও জঘন্য রকমের বখে যাওয়া স্বভাবের ছিল। বন্দরের কাছে চমৎকার একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল বার্ট; পর্দা ছিল বাড়িটার জানালায়, বাতাসে ভেসে আসত খোলা সাগরের গন্ধ, কিন্তু তবু তার বউয়ের পছন্দ হয়নি ওই বাড়ি। হাভানার হোটেলে গিয়ে

উঠেছিল মহিলা। সপ্তাহে দু'বার সে বার্টের কাছে আসত, ওর পকেট থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়ে ওড়ানোর জন্যে।

'আমার সঙ্গেই সাগরে যেত বার্ট। পানি যেখানে পরিষ্কার সেরকম একটা জায়গা খুঁজে বের করেছিলাম আমরা। পানিতে মাংস ফেলে হাঙরকে টেনে আনত বার্ট, তারপর ডুবুরীর পোশাক পরে নেমে যেত নিচে। প্রতিবার ওর কাণ্ড দেখে ঈশ্বরকে ডাকতাম আমি। লম্বা, চিকন লোক ছিল বার্ট, মাথায় চুল ছিল না বললেই চলে। নাকটা ছিল টিয়ে পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো। অদ্ভুত ভঙ্গিতে ডান কাঁধের ওপরে মাথাটা সর্বক্ষণ হেলিয়ে রাখত ও। দশ দিন ডুব দিল বার্ট, তারপর এগারো দিনের দিন জোর করে একা গেল সাগরে; বিকেল হয়ে গেল, কিন্তু ফিরল না। সেরাতে ওকে খুঁজতে বেরলাম আমরা; খুঁজে পেলাম ওর ভাড়া নেয়া নৌকো। খালি, কেউ ছিল না নৌকোয়। আমরা বুঝলাম বার্টকে খুঁজে পেতে হলে হাঙরের পেটের ভেতরে খুঁজতে হবে।

'ওর স্ত্রী যখন খবরটা শুনল, একটা কথাও বলল না; হাভানার হোটেলের বিল মিটিয়ে সোজা ফিরে গেল ইউনাইটেড স্টেট্সে। কাহিনীর শেষ আমি জানতে পেলাম এক বছর পরে,' কথা শেষ করল রোমিলিয়ো। আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসে আবার শুরু করল, 'হাভানার রাস্তায় হাঁটছি আমি, হঠাৎ সামনে ভিড়ের মধ্যে এক লোক! কোথায় দেখেছি? কাছে গেলাম, অবাক হওয়া ছাড়া কোন উপায় রইল না; সশরীরে বেঁচে আছে বার্ট, আমাকে চেনার লক্ষণই দেখাল না যদিও, এমনকি বলল না পর্যন্ত কেন সে অদৃশ্য হয়েছিল। আসলে ইচ্ছে করেই গায়েব হয়ে গিয়েছিল ও। ওকে ছেড়ে যখন চলে এলাম, আমার হঠাৎ মনে পড়ল একটা কথা। নৌকোয় ছিলাম তখন আমি আর বার্ট। আগের দিন বার্টের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছে বার্টের বউ। বার্ট আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা, রোমিলিয়ো, কোন মহিলা যদি তোমার জীবন অতীষ্ট করে তোলে, তাহলে কি করবে তুমি?" আমি বলেছিলাম, "ছুঁড়ে

ফেলে দেব ওকে হাঙরের মুখে।" স্রেফ কৌতুক করে বলেছিলাম, কিন্তু পরে আমার মনে পড়ল, অদ্ভুত এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল বার্টের ঠোঁটে। আবার একা, আনন্দময় জীবনে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও।'

অতিকায় সাগর-দানবের মধ্যে একটা মাছ কোজিমারের জেলেদের বুকে ঈশ্বর ভীতি জাগিয়ে তোলে। মাছটা হলো মান্টা রে বা অতিকায় বাদুড়। দানব রে চওড়ায় প্রায় তিরিশ ফিট হয়। ওজন এক টনের বেশি। যে কোন বড় নৌকো ডুবিয়ে দিতে পারে মান্টা রে, তবে সেজন্যে ওটাকে ভয় পায় না জেলেরা। কুসংস্কারমাখা আতঙ্ক আছে এই মাছকে ঘিরে। অতল জলের ভুতুড়ে দানব। মান্টা রে'র চলার গতিই ভীতিপ্রদ। দু'পাশের পাখনা প্রসারিত করে পানিতে সাঁতার কাটে না, যেন ভেসে বেড়ায় প্রজাপতির মতো।

ওগুলোর একটা যদি আপনাকে আক্রমণ করে, আবার তীর দেখার সৌভাগ্য আপনার নেই বললেই চলে। ওটা শুধু আপনার নৌকোই উল্টে দেবে না, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে পানির গভীরে, ছেড়ে দেবে হাঙরের মুখে।

ভূতের গল্পের মতো বংশ পরম্পরায় এই মাছের কাহিনী প্রচলিত রয়েছে জেলে পরিবারগুলোয়। একদিন চার-পাঁচ জন জেলে মুখোমুখি হলো একটা দানব রে মাছের, তাদের সঙ্গে হেমিংওয়ের দি ওল্ড ম্যান রেমিরেজও ছিল, পরে ওরা বলেছে, দানব রে'টাকে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসতে দেখে কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল ওরা। উপকথার সেই তিন গর্গনের একজন, মেডিউসার মতোই, কেউ তাকালে তাকে চোখের দৃষ্টিতে পাথর বানিয়ে দেয়ার ক্ষমতা আছে মাছটার, বলে কোজিমারের জেলেরা। তবে আজ পর্যন্ত কোন মান্টা রে'র আক্রমণের শিকার কাউকে হতে হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

মান্টা রে'র মতো দানব মাছ ধরার চেষ্টা ভুলেও করে না

জেলেরা। মারতে হলে হার্পুন-গান দরকার, যা ওদের নেই। দড়িদড়া যখন পানিতে ফেলে, ঈশ্বরের কাছে জেলেরা প্রার্থনা করে যাতে কোন মান্টা রে টোপ না গেলে, কারণ ওই মাছের টোপ গেলার অর্থ অন্তত কয়েকশো ফিট দড়ি হারানো।

মান্টা রে আমি কখনও দেখিনি–তবে দেখলাম, ডিসেম্বরের যে বিকেলে এল্ সুইযো আমাদের কুঁড়ের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

সারাটা দিন ছিল অসহ্য উত্তাপ; সন্ধেয় ছাড়ল গরম হাওয়া, ভাসিয়ে নিয়ে এলো ধূসর মেঘ। সাগর তীরের নীল ঢেউগুলো ভেঙে পড়ার আগেই বাতাসের ঝাপটায় ওগুলোর মাথায় তৈরি হলো ফেনার সাদা মুকুট। এল্ সুইযোর হাতে বরাবরের মতোই একটা হুইস্কির বোতল। আজকে ফ্লাস্কে করে গরম কফি আর দুধও নিয়ে এলো ও।

'এক ঘণ্টা পর একা রওয়ানা হব আমি,' বলল সুইযো। 'সঙ্গে যাবেন আপনি? আমার মনে হয় না সাগর আরও অশান্ত হবে। এই আবহাওয়া সোর্ডফিশ শিকারের জন্যে দারুণ।'

সাগরযাত্রার জন্যে নৌকোগুলোকে সৈকতে মেরামত করে রেখেছে জেলেরা। অনেকে বাতি নিভিয়ে অর্ধেক গতি তুলে নৌকো নিয়ে বেরিয়েও পড়েছে সাগরে। একটু পরেই আঁধারে হারিয়ে গেল নৌকোগুলো, শুধু দেখা গেল তাদের গতিপথে ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে ওঠা ফসফরাসের আলো। দু'ঘণ্টা লাগল আমাদের হাঙর শিকারের এলাকায় পৌঁছতে, কারণ আজকে আমরা দূর-সাগরে এসেছি।

এল্ সুইযো যখন সাগরে দড়ি ফেলল, আমার মনে হলো বিশাল মহাসমুদ্রে আমরা যেন একাই আছি। হাভানা বাতিঘরের আলোর রেখা এখনও দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারের এখানে ওখানে জ্বলছে নিভছে আরও অনেকগুলো বাতি। তবে অন্যান্য রাতে যেমন টর্চের আলোয় বোঝা যায় অন্য নৌকোর অবস্থান, তেমন বোঝা যাচ্ছে না আজকে। উপকূল রেখাকে যেন গিলে নিয়েছে

কালো সাগর। আজকে সাগর এতই ফুঁসছে যে নৌকোয় এক নাগাড়ে কয়েক সেকেন্ডের বেশি দাঁড়ানোই যাচ্ছে না। মত্ত ঢেউয়ের কারণে পিপের হারিকেনের বাতি চোখে পড়ছে অনেকক্ষণ পর পর। মাঝে মাঝে দু'একটা বাতি হঠাৎ হারিয়ে যাচ্ছে, আমরা ভাবছি টোপ গিলেছে মাছ, কিন্তু নৌকো নিয়ে পূর্ণ গতিতে ছুটে গিয়ে দেখছি ক্ষণিকের জন্যে বড় একটা ঢেউয়ের আড়ালে শুধু চলে গিয়েছিল পিপেটা।

আরও অশান্ত হয়ে উঠছে সাগর। নিরাপত্তার খাতিরে চিকন একটা দড়ি দিয়ে নৌকোর সঙ্গে নিজেকে বেঁধে নিল এল্ সুইযো। ঝড়ের সময় এমনি ভাবেই নিজেকে বেঁধেছিলেন ক্যাপ্টেন কিড। অপেক্ষা করছে সুইযো। দেখে মনে হলো না নৌকোর হঠাৎ হঠাৎ উত্থান-পতনে, বা আমার শারীরিক-মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তিত।

'হাঙর আমাকে খেলেও তোমার ঘুম নষ্ট হবে বলে মনে হচ্ছে না,' বললাম আমি।

'আপনাকে শিকার করতে হচ্ছে না,' প্রায় ধমকে উঠল সুইযো। 'নৌকোয় টিকে থাকুন, তাহলেই হবে। আমার ব্যাপারটা ভিন্ন, এই দুলুনিতে একই সঙ্গে নৌকোয় দাঁড়িয়ে থাকা আর সোর্ডফিশ নৌকোয় তুলে আনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

জবাব না দিয়ে ওর মতো করেই আরেকটা দড়ি দিয়ে নিজেকে বেঁধে নিয়ে অপেক্ষায় রইলাম আমি। কিছুক্ষণ পরেই তীরের জন্যে আমার মন কাঁদতে লাগল, মনে পড়ল কোজিমারের ছোট্ট ক্যাফের কথা, আমার কুটিরের কথা, অতি শক্ত কিন্তু স্থির আমার বিছানার কথা। এই রকম উত্তাল সাগরে টিকে থাকতে হলে সুইযোর মতো প্রাগৈতিহাসিক কোন মদে চুর হওয়া লোকই দরকার, আমাকে নয়। এক গ্লাস হুইস্কি গিলে নিলাম আমি। পেটের কাছে যে মোচড় অনুভব করছিলাম, কিছুটা কমল সেটা; এতই কম কমল যে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এল্ সুইযোর হাত থেকে

টর্চটা নিয়ে পিপেগুলোর ওপরে আলো ফেললাম আমি। খুব আস্তে চলছে নৌকোর এঞ্জিন। হারিকেন-বাতির একটা অর্ধবৃত্তের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এখন রয়েছি আমরা। গুনতে শুরু করলাম আমি। এক…দুই…চার…গোনার মাঝেই হঠাৎ আমার কাছ থেকে টর্চটা কেড়ে নিল এল্ সুইযো, তাক করল আলোটা কাছের দুটো পিপের দিকে।

'মিরা! মিরা!' চেঁচিয়ে উঠল ও। মিরা মানে, দেখুন।

হারিকেনের বাতি দুটো প্রচণ্ড আক্ষেপে মরণ-নাচ জুড়েছে। দশ সেকেন্ড লাগল আমাদের পিপের কাছে পৌঁছতে। দু'জনে আমরা দুটো দড়িতে টান দিয়ে বুঝলাম অপর প্রান্তের মাছগুলোর একেকটার ওজন কমপক্ষেও কয়েকশো পাউন্ড হবে। জীবনে প্রথম এত বড় মাছের টান আমি অনুভব করলাম। মনে হলো দড়ির শেষ মাথায় বাঁধা আছে কোন উন্মত্ত ঘোড়া। মাঝে যদিও পানির বিস্তর ব্যবধান, তবু বড় মাছের প্রথম টানের জোর এত বেশি যে আপনার মনে হবে কোনদিনই ওটাকে এক ইঞ্চি কাছেও টেনে আনতে পারবেন না। সময় মতো দড়িতে ঢিল দিতে হবে আপনাকে, দেরি করলেই সর্বনাশ, প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগবে বাহুতে। হয়তো টানছেন গায়ের জোরে, ভাবছেন ধরে রাখতে পারবেন, হঠাৎ সড়াৎ করে পিছলে যাবে দড়ি, হড়হড়িয়ে ছুটে যাবে আপনার মুঠো করা তালুর মাঝ দিয়ে, কেটে ক্ষতবিক্ষত করে দেবে আপনার তালু। আবার হয়তো দড়ি ধরবেন, কিন্তু নিঃসন্দেহে ছুটে যাবে দড়ি। আপনার গোটা হাত, কাঁধ, পিঠ ব্যথায় ততক্ষণে টিশটিশ করছে। আর যদি তালুতে দড়ি একপাক দেয়ার মতো ভুল করে থাকেন, তাহলে হয় মারাত্মক আহত হবেন অথবা সাগরে ছিটকে পড়বেন। একই সঙ্গে দুটোও ঘটতে পারে। যে মাছ স্বচ্ছন্দে নৌকো টেনে নিয়ে যায় কয়েকশো গজ, সেই মাছ আপনাকেও টেনে নেবে অতি সহজে। ঠিক বোতলের গ্যাস যেমন কর্কটাকে উড়িয়ে দেয়, তেমনি দেখবেন আপনি আর নৌকোয়

নেই, উড়ে গিয়ে পড়েছেন সাগরে।

থেমে গেল দড়ির টান। হুক গিলে ফেলার চমক সামলে নিতে থেমেছে মাছটা। এখনই সময় দড়ি গোটানোর, গোটাতে হবে খুব দ্রুত, কারণ আর কয়েক সেকেন্ড পরই আবার ছুটতে শুরু করবে মাছ। এক গজ এক গজ করে সাগরের গভীর থেকে তুলে আনতে হয় ভারী মাছগুলোকে। আবার দড়ি ছুটে যাবে। ধরে ফেলবেন। চলতে থাকবে এভাবে। এক সময় কমে আসবে আপনার বা মাছটার শক্তি, জিতে যাবে যেকোন পক্ষ। নৌকোয় অনেকখানি দড়ি জড় হয়ে গেছে, আর কিছুক্ষণ পরেই ওপরে উঠে আসবে দানব মাছ। এই সময়টাই সম্ভবত সবচেয়ে উত্তেজনাকর সময়। এখন...আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি জানবেন কি মাছ ওটা। হাঙর? টিউনা? ব্যারাকুডা? বড় কোন কিছু? ছোট? শেষ মুহূর্ত চলে না এলে এই প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো হাঙর টোপ গিলেছে, ঘাই মারল সোর্ডফিশের মতো, টান দেখে বোঝার উপায় রইল না ওটা কি। ছয়শো পাউন্ডের মাছ হয়তো ওঠানোর সময় কম ঝামেলা করল তিনশো পাউন্ডের মাছের চেয়ে। কতখানি লড়বে সেটা অনেকাংশে নির্ভর করে বড়শি কোথায় গেঁথেছে তার ওপরে।

উঠে এসেছে মাছ সাগরের সমতলে, এখন শক্তি সঞ্চয় করবে শেষ লড়াই লড়ার জন্যে। এই সময়ের টানাপোড়েন প্রায় সময়েই সব চেয়ে বেশি হয়। (সোর্ডফিশ এই সময় পানি ছেড়ে লাফিয়ে উঠতে পারে পাঁচ বা দশ ফিট ওপরে।) আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরই নৌকোর পাশে মাছটাকে তুলে আনতে পারবেন আপনি। একটুও যাতে হাত না কাঁপে। মাছটা আপনার চেয়ে খুব বেশি পরিশ্রান্ত নয়।

বাতির প্রথম ঝাঁকি আর আমি যখন আমার হাঙরটাকে নৌকোর তিন ফিটের মধ্যে নিয়ে এলাম, এর মাঝের উত্তেজনায় কখন যেন কেটে গেছে তিরিশ মিনিট। সময়টা আমার কাছে মনে

হলো অনন্তকালের মতো।

'পরেরটা এর অর্ধেক সময়ে ধরতে পারবেন আপনি,' বলল এল্ সুইযো। নিজের মাছটা নৌকোয় তুলে আনতে মাত্র সাত মিনিট লেগেছে ওর। 'পরিশ্রমও হবে অর্ধেক। দেখবেন ঠিক সময়ে শিখে যাবেন দড়িতে টান দেয়া।'

নৌকোর খোলে বসে আকাশের দিকে তাকাল সুইযো। আকাশে ঘন কালো মেঘ করেছে, মেঘের ভেলা ভেসে যাচ্ছে বাতাসের তাড়ে। ওর ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হয়েছে, পড়ে যাচ্ছে বাতাস, নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে গরম, মৃদু সমীরণ; শুকিয়ে দিচ্ছে আমাদের ভিজে শার্ট।

গানওয়েলে হেলান দিয়ে এল্ সুইযোর দিকে তাকালাম আমি, দেখলাম বড়শি দুটোতে নতুন করে টোপ লাগাচ্ছে ও। কাজ সেরে আবার দড়ি দুটো পানিতে ফেলে দিল। নড়াচড়া করার শক্তি নেই আমার, ব্যথার চোটে মনে হচ্ছে অবশ হয়ে গেছে হাত দুটো।

চাঁদের আলোয় দেখলাম গলুইতে বাঁধা দুটো হাঙরের একটার চোয়াল থেকে নেমে আসছে কালচে রক্তের ধারা। ছোট্ট একটা ঘুম দেবার জন্যে দড়ির কুণ্ডলীর ওপরে শুয়ে পড়লাম আমি।

ঘুম যখন ভাঙল, বাতাস থেমে গেছে একেবারেই। এক কোণে, আধ ঘুমন্ত অবস্থায় কালো পানিতে ভাসমান পিপেগুলোর ওপরে টর্চের আলো ফেলছে এল্ সুইযো।

'সোর্ডফিশের জন্যে ভাল আবহাওয়া,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'শুধু সোর্ডফিশ নেই...'

ক্ষতিপূরণ করছে ও পুরু ঠোঁট গোল করে একটু পরপর হুইস্কির বোতলে চুমুক দিয়ে। বোতলে তরলের পরিমাণ দেখে বুঝলাম অন্তত একঘণ্টা ঘুমিয়েছি আমি।

'আমিও একটু ঘুমাব,' একটু পরে আমার হাতে টর্চ ধরিয়ে দিয়ে বলল সুইযো। 'মাছে ঠোকর দিলে আমাকে জাগিয়ে দিয়েন।'

কিন্তু, মাছ ঠোকর দেবে সেই আশায় থাকলাম না আমরা। তার আগেই অস্বাভাবিক একটা ঘটনা ঘটল।

তিরিশ কি চল্লিশ গজ দূরে মৃদু একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো পানির বুকে। ছোট ছোট গোল ঢেউ উঠল, কিন্তু তা বাতাস বা সাগর ফুলে ওঠার কারণে ঘটল না। কি যেন একটা ভেসে উঠল পানির ওপরে। অচেনা, কালো, বিশাল একটা কিছু। ঘুমিয়ে পড়ার সময় পেল না সুইযো, আমারই মতো নৌকোর কিনারা আঁকড়ে ধরে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল ও। টর্চের আলো ফেলে ওটাকে দেখছি আমি।

'আলো নিভিয়ে দিন শিগ্‌গির,' ফিসফিস করে বলল সুইযো।

আমি আলো নিভিয়ে দিতেই জাহাজের পালের মতো দুটো পাখনা বেরিয়ে এলো কালো জিনিসটার দু'পাশ থেকে, পানিতে বাড়ি দিয়ে সাদা ফেনা তুলল পাখনা দুটো। পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন গোল ঢেউ হয়, তেমনি ঢেউ উঠল সাগরের বুকে। এল্ সুইযোর অনাকর্ষণীয় চেহারা এই মুহূর্তে ভয়ে কেমন যেন হয়ে গেছে। হাসল ও সাধারণ মানুষের মতো, হাসির মাঝে ওর নিজস্বতায় বুঝিয়ে দিল ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ও। মুখে আড়ষ্ট হাসি ধরে রেখে আমার দিকে তাকাল সুইযো। তুতলে বলল, 'রেয়া মান্টা...দানব রে...' ভয় পেলে কি ভাবে মানুষ? কিছুই আমি ভাবলাম না—এমনকি যে কোন সময়ে দৈত্যটা হামলা করতে পারে, তা-ও নয়। আমার শিড়দাঁড়া বেয়ে নেমে গেল না ছমছমে কোন শীতল স্রোত, শুধু মনে হলো আমার শরীরের প্রতিটি কণার ওজন বেড়ে গেছে। অবশ লাগল নিজেকে। বিবশ হয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকলাম তিরিশ গজ দূরে, ওখানে পাখনা দিয়ে পানিতে বাড়ি মারছে মান্টা রে।

এক সময় থেমে গেল পানিতে পাখা আছড়ানো, স্লো মোশন ছায়াছবির মতো ধীর গতিতে ঘুরল মাছটা। কয়েক সেকেন্ড লাগল পুরো ঘুরতে। তারপর তলিয়ে গেল পানিতে। সাগরের ছয়-সাত

ফিট গভীরে গিয়ে থামল ওটা। পানির তলায় গিয়েও বোধহয় ঘুরছিল, কারণ ওই জায়গাটায় আলোড়িত হচ্ছিল সাগর। একটু পরেই শান্ত হয়ে গেল সব। গোটা ব্যাপারটা ঘটতে এক মিনিটের বেশি লাগল না।

আবার রে দেখা দেবে ভেবে কয়েক মুহূর্ত নড়লাম না আমরা। কিন্তু আর কিছু ঘটল না। মাছ ধরার আর প্রশ্নই আসে না, দড়িদড়া গুটিয়ে নৌকোয় তুলে নিলাম আমরা। এল্ সুইযো এঞ্জিন চালু করতে চেষ্টা করল। কোন আওয়াজ করল না এঞ্জিন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো সুইযো।

প্রায়ই কোজিমারের নৌকোগুলোর প্রাগৈতিহাসিক এঞ্জিন প্রথম বারে চালু হয় না; কখনও কখনও পাঁচ-ছয়বার চেষ্টা করতে হয়, বদলাতে হয় যন্ত্রাংশ, ফুঁ দিয়ে নামাতে হয় পাইপের পানি বা বাড়ি মারতে হয় হাতুড়ি দিয়ে। এঞ্জিন চালু না হওয়ার অর্থ দু'তিন মিনিটের দেরি; তার বেশি নয়।

আজ রাতে ভাগ্য আমাদের আরও অনেকক্ষণ সাগরে আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নিল। প্রাণ ফিরে পেল না এঞ্জিন। বৈঠা চালিয়ে স্রোত ঠেলে তীরে ফেরা অসম্ভব। এল্ সুইযো যখন বুঝল গোটা এঞ্জিন খোলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই, রাগে গরগর করতে লাগল সে; দড়ি আর যন্ত্রপাতির গায়ে মনের ঝাল মেটাতে লাথি মারতে লাগল। ইতালিয়ান ভাষার মতোই স্প্যানিশ ভাষাও গালাগালিতে কম যায় না; এঞ্জিন, ঈশ্বর, মাছধরা, হাঙর, ইত্যাদির গুষ্টি উদ্ধার শেষ করে, গভীর মনোযোগে এঞ্জিনের সামনে বসে ডুবে গেল সুইযো মেরামতের কাজে।

'এমনকি একটু হুইস্কি পর্যন্ত নেই আর,' দুঃখিত হয়ে বলল ও।

আমারই মতো, মাঝেই মাঝেই কাজ থামিয়ে সাগরের দিকে তাকাচ্ছে সুইযো। দু'জনেই আমরা জানি কি খুঁজছে আমাদের ভীত চোখের দৃষ্টি।

ডুব দিয়ে চলে গেছে মান্টা রে, আর আসবে না, নাকি আমাদের নৌকোর কয়েক ফ্যাদম নিচে নিঃশব্দে ভেসে বেড়াচ্ছে ওটা? অবশ করা একটা ভীতি নিয়ে সাগরের দিকে তাকাচ্ছি আমরা। আমার চোখে এখনও ভাসছে সেই ভয়ানক অথচ সুন্দর দৃশ্যটা। যতটুকু দেখেছি, আমাদের নৌকোর চেয়ে অনেক বড় ছিল দৈত্যটা। কোজিমারের কিংবদন্তী আমি বিশ্বাস করিনি, তবে ভাল মতোই জানি, ইচ্ছে যদি হতো, প্যানকেক ওল্টানোর মতোই নিমেষে আমাদের নৌকো উল্টে দিতে পারত ওটা।

ভোরের আলো ফুটতে আরও অন্তত এক ঘণ্টা বাকি। আমাদের চারপাশের সাগর আর আকাশ ধূসর, ময়লা রং ধরেছে। রংটা এমনই, দেখে মনে হয় দুঃস্বপ্নে এই রং মানাত। একটা কথাও বলছে না এল্ সুইযো। এঞ্জিন নষ্ট হওয়ার কারণ ধরতে পেরেছে সে, আর দশ মিনিটের মধ্যেই সেরে ফেলতে পারবে।

হঠাৎ দুলে উঠল আমাদের নৌকো। নৌকোর তলায় যেন ঘষা দিয়ে গেছে কিছু একটা। এল্ সুইযো পানিতে তাকাল, তবে এখনও ভাল মতো কিছু দেখা যাচ্ছে না। আলো অনেক কম। উঠে দাঁড়াল ও। বলল, 'কিছু না, একটা হাঙর বোধহয় বেশি কাছে চলে এসেছিল।'

শেষ পর্যন্ত ছোটখাটো একটা গর্জন ছেড়ে চালু হলো এঞ্জিন। সোজা তীরের দিকে রওয়ানা দিল সুইযো। উপকূলের একশো গজের মধ্যে পৌঁছে নিজেদের নিরাপদ বলে মনে হলো আমাদের। হঠাৎ দিকচক্রবালের ওপার থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো সূর্যটা, গ্রীষ্মমণ্ডলে এমনই ঘটে, আলোয় উদ্ভাসিত করে দিল চারপাশ। ঝিলমিল করে উঠল নীল সাগর। তীরের দিকে তাকিয়ে আমাদের মনে হলো গোটা গ্রামের সবাই সৈকতে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকজন ঘিরে আছে এক দল জেলেকে। আমরা ভাবলাম ওদের কেউ একজন আজকে অস্বাভাবিক কোন মাছ ধরে এনেছে। কাছে গেলাম আমরা, এতক্ষণে দেখতে পেলাম অ্যালভারেজের নৌকো।

সৈকতে তুলে রাখা হয়েছে ওটা, ভেতরে থইথই করছে পানি। দড়িদড়া ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। নৌকোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে অ্যালভারেজ; গায়ে ভিজে জামা। সূর্যের আলোয় যদিও দ্রুত শুকিয়ে আসছে জামা, তবুও বুঝতে আমাদের দেরি হলো না যে সাগরে পড়ে গিয়েছিল অ্যালভারেজ। এখনও ও জানে না ঠিক কি ঘটেছিল। মাছ ধরছিল ও, এমন সময় প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে ওর নৌকোটা প্রায় পানি ছেড়ে উঠে পড়ল। পরমুহূর্তে হুঁশ ফিরতেই ও দেখল নৌকোর কয়েক গজ দূরে সাগরে সাঁতার কাটছে ও।

কোনরকমে নৌকোয় উঠে দেখল পানিতে অর্ধেক ভরে গেছে নৌকোটা, ডুবে যে যায়নি সেটাই আশ্চর্য। নৌকো নিয়ে উপকূলের দিকে ফিরতে চাইল ও, কিন্তু ধাক্কা খেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে এঞ্জিন। উপায় না দেখে সাহায্য চেয়ে চেঁচাল অ্যালভারেজ। দুটো নৌকো ওর হাঁক ডাকে কাছে এলো। ওই নৌকো দুটোই দড়ি দিয়ে বেঁধে ওর নৌকোটা তীরে টেনে এনেছে। উদ্ধারকারীরাও বুঝতে পারছে না কি ঘটেছিল অ্যালভারেজের ভাগ্যে।

তিন

একদিন সকালে সেই লড়ঝড়ে বাস কোজিমার থেকে হাভানায় ফিরিয়ে নিয়ে এলো আমাদের।

এ কয়দিনে তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি হাভানার। বন্দরে এসেছে একটা নতুন জাহাজ, পিনার ডি রিয়োর তামাক খামারে

নতুন জীবন শুরু করেছে একদল সদ্য আগত অভিবাসী। পুরনো শহরের একটা প্রাচীন হোটেলে উঠলাম আমি। আজব হোটেল; কোন ট্যুরিস্ট গাইডে নাম নেই; থাকবেও না কোন কালে। উঠনে, আমার জানালার নিচে, একটা চেয়ারে বসে বুড়ো এক নিগ্রো সারাদিন গাঁজা টানে।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে খুব সহজেই পাওয়া যায় গাঁজা। হোটেলের টেরেসে দাঁড়ালে চোখে পড়ে নীরব একটা বাড়ি; যেন উঠে এসেছে এডগার অ্যালান পো'র ভৌতিক গল্প থেকে; ভয়ানক জায়গা, দেখে মনে হয় পরিত্যক্ত বাড়ি, জানালা খোলা হয় না কখনও। বাড়ির টেরেসে পড়ে আছে মুখোশ আর চটকদার পুরনো পোশাক। ওগুলোর মধ্যে আছে লাল রং মাখানো দুটো বড় অ্যাপ্রন। ওগুলো কে ফেলে গেছে সেটা আমি চেষ্টা করেও আবিষ্কার করতে পারিনি।

কিন্তু এই হোটেলের অস্বাভাবিকতার এখানেই শেষ নয়, আমার পাশের ঘরের লোকটা যেন প্রেতে পাওয়া, শুধু রাতেই বেরোয় সে। চোখের ওপর টেনে রাখে হ্যাটের কানা। দিনে সে ঘরের বাইরে যায় না। কেউ তার কাছে আসে না। লোকটা আমেরিকান। খাবারও ঘরে বসেই খায় সে। একদিন সে চলে গেল–দু'জন সশস্ত্র পুলিশ এসেছিল তাকে ধরে নিয়ে যেতে।

ক্যারিবীয়ানের দ্বীপগুলো, বিশেষ করে কিউবা, আমেরিকান পলাতক আসামীদের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ। এই হোটেল প্রায়ই এসব ভ্রমণকারীদের আশ্রয় দিয়ে থাকে। কদিন পরে জানলাম, আমার ফ্লোর ওয়েইটারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমিও ট্রপিকে বাধ্যতামূলক ছুটি কাটাতে এসেছি। ওয়েইটারের চেহারার বর্ণনা না দিয়ে পারছি না, দেখে মনে হয় এই কদিন আগে শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষ হয়েছে; মুখ, দাঁত, প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা লোম ভরা হাত–সবই এখনও শিম্পাঞ্জিদের মতোই আছে।

এক বিকেলে পায়ে হেঁটে বেরলাম আমি, বন্দরটা ঘুরে দেখব।

কার্ট ব্লোম নামের এক লোককেও খুঁজব। এই লোকের নাম আমাকে বলেছে মিগুয়েল রেমিরেজ, হেমিংওয়ের ওল্ড ম্যান। কার্ট ব্লোম জার্মান, কয়েক বছর হলো কিউবাতেই আছে; অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠেছে হাঙর শিকারী হিসেবে। তার বিশেষত্ব হচ্ছে ছিপ দিয়ে বড় মাছ ধরা। আমারও ইচ্ছে এভাবে মাছ ধরে দেখব।

আগেও অনেকেই এসেছে ছিপ দিয়ে বড় মাছ ধরবে বলে। যেমন আমেরিকান আন্ডারপ্যান্ট কিং মাইকেল লার্নার, রেমন্ড লোয়ি, আর বিখ্যাত লেখক হেমিংওয়ে। কোজিমারে যেভাবে মাছ ধরা হয় তার চেয়ে অনেক আলাদা ছিপ দিয়ে মাছ তোলা। হুকগুলো আকারে সমানই, কিন্তু লাইনটা সাধারণ পাইক ধরার সুতোর মতো; কাজেই শুধু শক্তি নয়, কৌশলও প্রয়োজন। যেকোন সময়ে ছিঁড়ে যেতে পারে নাইলনের সুতো। কয়েক ঘণ্টা, কখনও কখনও সারাদিনও লেগে যেতে পারে মাছটাকে কাছে নিয়ে আসতে। কয়েকজনের কথা শুনেছি, সোমবার বিকেলে বড় কোন লড়াকু টিউনা বা মার্লিন বড়শিতে বাধিয়েছে, তুলতে পেরেছে সেই মঙ্গলবার দুপুরে।

ডেকে বল্টু দিয়ে আটকানো একটা চেয়ারে বসে শিকারী। তার দু'পায়ের মাঝখানে চেয়ারের সঙ্গে সকেটে আটকানো থাকে খাটো ছিপের হাতল। ছিপে থাকে মস্ত একটা হুইল। কয়েকশো গজ সুতো পেঁচানো থাকে তাতে। হুইলটা এমন ভাবে তৈরি যে মাছ টান দিলে ঘুরতে ঘুরতে লাইন ছাড়ে, ফলে ছিপ ভাঙার ঝুঁকি কমে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মাছটাকে বেশি দূরে যেতে দেয়া চলবে না। বেশি দূরে যেতে দিলে মাছ তুলতে সময় লেগে যায় অনেক বেশি। এখানেই শিকারীর দক্ষতার পরিমাপ হয়। কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাইনে ঢিল দেয়া চলবে না, লাইনে ঢিল পড়লেই হুক ছুটিয়ে নেয়ার সুযোগ পায় মাছ।

এসব অপরীক্ষিত তত্ত্ব জপতে জপতে কার্ট ব্লোমের বাড়িতে, বন্দরে গেলাম আমি। ওকে পাব তেমন আশা নেই বললেই চলে।

রেমিরেজ আমাকে বলেছে, আমেরিকানদের ফিশিং গাইড হিসেবে কাজ করে ব্লোম; চল্লিশ ডলার তার চার্জ, কয়েকশো ডলার দ্রুতই জমে যায়, আর জমলেই বাড়িতে সে পা ফেলে না মদ খেয়ে সব পয়সা উড়িয়ে দেয়ার আগে। একেকবার মাছ ধরে ফেরার পরে তার পাঁচ-ছয়জন রক্ষিতার যেকোন একজনের বাড়িতে সময় কাটায় সে। হাঙর শিকার শুরু করার আগে লোহিত সাগরে মুক্তো-শিকারী ছিল ব্লোম। তখন তার সঙ্গে আরব রাজকুমারদের পরিচয় হয়। তাদের জীবন দর্শন এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে আছে ব্লোম।

ক্রিয়েগ্‌স্‌মেরিনের প্রাক্তন পেটি অফিসার কার্ট ব্লোমের যে চিত্র রেমিরেজ আমাকে দিয়েছে, সেটা আশ্চর্যজনক ভাবে হেনরি দ্য মনফ্রিডের বইয়ের নায়কের সঙ্গে মিলে যায়। উনিশশো তিরিশ সালে, পঁচিশ বছর বয়সে, অভিযানের নেশায় জন্মভূমি বার্লিন ত্যাগ করে আরবের উপকূলে যায় ব্লোম। ইচ্ছে ছিল কফি প্ল্যান্টার হবে। কিন্তু মুক্তো শিকার করতে শুরু করে সে ইয়ামেনের উপকূলে, ফারাসান দ্বীপপুঞ্জের কাছে। ছোট্ট একটা নৌকো ভাড়া করেছিল সে, নিয়োগ দিয়েছিল কয়েকজন সোমালি ডুবুরিকে। তীরের কাছে, যেখানে পাঁচ-ছয় ফ্যাদম পানির নিচে পাওয়া যায় মস্ত ঝিনুক, কখনও কখনও এক নাগাড়ে এক মাস সেখানে মুক্তো খুঁজত সে। নিজেও ডুব দিত। 'ডোল'-এর সঙ্গে সাঁতার কেটেছে সে। ডোল হচ্ছে এক ফুট চওড়া টর্পেডো-মাছ, প্রচণ্ড ইলেক্ট্রিকাল শক দিতে পারে; মনে হয় যেন গরম ইস্ত্রির ছ্যাঁকা লেগেছে। লোয়েথিও দেখেছে ব্লোম। স্পর্শ লাগলে গায়ে সঙ্গে সঙ্গে ফোস্কা পড়ে যায়। আর আছে প্রকাণ্ড শেল-মাছ, মস্ত একটা ফাঁদের মতো, হাতের কব্জি বা পায়ের পাতায় যখন খটাশ করে বন্ধ হয়ে যায়, ডুবুরির উপরে ওঠার একমাত্র উপায় হাত বা পায়ের সেই অংশ কেটে বাদ দেয়া।

ফারাসান দ্বীপপুঞ্জের কাছে সবচেয়ে বড় মুক্তোগুলো পাওয়া যায়, কিন্তু উপকূলের ওই অংশে পানিতে নামা অত্যন্ত বিপজ্জনক। হাঙরের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে একটা কালো শার্ট পরে পানিতে নামত ব্লোম। কিছুদিন পরে দু'মুঠো মুক্তোর মালিক বনে গেল সে। মধ্যপ্রাচ্যের পতিতালয় আর জুয়ার টেবিলে শেষ করল মুক্তো বেচা টাকা। তারপর আবার সেই আগের পেশা–মুক্তো শিকার। মুক্তো, স্মাগলিং, স্যালভেজ ওয়র্ক, ক্রিয়েগ্‌স্‌মেরিন, তারপর কিউবা।

জার্মানরা আত্মসমর্পণ করার কয়েক মাস পরে কিউবাতে আসে ব্লোম, কেউ জানে না কিভাবে। এসেই স্যান্টিয়েগো ডি কিউবার অদূরে, ক্যামারগুয়ে প্রদেশের উপকূলে, ছোট একটা হাঙর-ফিশারি দেয় সে। বারোটা নৌকো ছিল তার। ফ্যাক্টরিতে কাজ করত তিরিশজন শ্রমিক। নৌকোগুলো হাঙর শিকারে ব্যবহৃত হতো। ক্রেন আর মেশিনপত্র কিনেছিল হাঙরের চামড়া ছাড়িয়ে বাজারে বেচার জন্যে। একদিন মাথায় কি খেলল, সব কিছু বিক্রি করে হাভানায় চলে এলো সে; মাত্র কয়েক সপ্তাহে উড়িয়ে দিল সমস্ত টাকা।

তারপর থেকেই ফিশিং-গাইড হিসেবে কাজ করছে ব্লোম। একটা নৌকো আছে তার, আঠারো ফিট লম্বা; এতোই গোছানো যে ওটাকে ইয়টই বলা চলে, ছুটতে পারে যেকোন এঞ্জিনওয়ালা জলযানের মতো দ্রুত। নাম ওটার এল টিবুরোঁ–হাঙর!

এই হচ্ছে কার্ট ব্লোম। একেই খুঁজতে হবে হাভানায়। স্বাভাবিক ভাবেই বাড়িতে থাকে না সে, কাজেই আমার খোঁজার এলাকাটা হলো বিস্তৃত। পরপর কয়েক রাত ওর খোঁজে চিরুনি চালালাম আমি শহরে।

প্র্যাডোর চারধারের গলিতে, যেখানে নিগ্রো মুলাটো আর সাদা মেয়েমানুষরা রাতে আশ্রয় নেয়, সেখানে গোপন, ধোঁয়া ভরা আড্ডা খানা আবিষ্কার করলাম আমি। ঢুকলাম শাংহাই আর

ট্রপিকানায়। বাজি ধরে বলতে পারি এরকম জায়গা দুনিয়ার আর কোন প্রান্তে নেই।

শাংহাই আর ট্রপিকানা হচ্ছে সিনেমা হল আর থিয়েটারের নাম। শাংহাইতে আইনের বিধিনিষেধ ছাড়াই নীলছবি দেখা চলে। টিকেটের দাম খুবই কম। মাত্র কয়েক সেন্ট্যাভো। ছবিগুলো আসে বার্লিন আর প্যারিস হতে। দর্শকদের মধ্যে আছে সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহিণী। বিরতির সময়ে মিষ্টি বিক্রেতারা দর্শকদের কাছে নোংরা ছবি বেচে। সাইড বিজনেস। আর ট্রপিকানা স্থপতির এক আজব সৃষ্টি। নিয়ন সাইন দিয়ে আলোকিত একটা সত্যিকার বনের মাঝে ট্রপিকানা থিয়েটার। থিয়েটার হল আছে দুটো, দুটো স্টেজ, দু'জন ম্যানেজার, টিকেটের দামও হাভানার যেকোন বিনোদন কেন্দ্রের তুলনায় দ্বিগুণ। লাস ভেগাস আর শিকাগো থেকে আনা রুলেত টেবিল আর স্লট মেশিনও আছে ওখানে। মেশিনগুলো একেকবারে এক ডলারও হজম করে নিতে পারে।

প্যারিসের ভেলোড্রোম দ্য হিভার সমান হবে ট্রপিকানার আকার। আকাশযানে হাভানার সঙ্গে মায়ামির দূরত্ব একঘণ্টা। প্রতিদিন ব্যবস্থাপনার চার্টার করা একটা প্লেন হাভানা থেকে রওয়ানা হয়, রাতের বিলাসপ্রিয় অতিথিদের নিয়ে আসে মায়ামি থেকে।

অসংখ্য বারটেন্ডারকে প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত একজনকে আমি খুঁজে পেলাম, যে আমাকে সাহায্য করতে পারবে। লোকটা ট্রোপি-র্যাঞ্চ সেলুনে কাজ করে। সেসময়ে এসথেলা মেরি নামের এক আর্জেন্টাইন স্ট্রিপ-টীয ড্যান্সার ওখানে অনুষ্ঠান করছিল। মেয়েটাকে গত কয়েক সপ্তাহ আমি পকেটে নিয়ে ঘুরেছি। ম্যাচ বাক্সে তার ছবি ছাপা হয়েছে। সে-ছবিতে মেয়েটা শুধু কালো এক জোড়া মোজা পরে আছে। ঠোঁট রসাল, চোখে মাদকতা মাখা আহ্বান। (কিউবাতে বাচ্চাদের ম্যাচ নিয়ে খেলতে দেয়া হয় না।)

এই সন্দরী লালচুলো মেয়েটা ট্রোপি-র্যাঞ্চকে একেবারে

জমিয়ে তুলেছিল। হাভানায় দীর্ঘদিন কাউকে এত খোলামেলা দেখা যায়নি। আর দেখার কথা যখন উঠলই, বলতে হয় এত দেখা অনেকদিন কেউ দেখেনি! প্যারিস আর বার্লিনের সবচেয়ে সাহসী স্ট্রিপ-টীযও হাভানার প্রতি রাতের সাধারণ যেকোন নাচের অনুষ্ঠানের তুলনায় একেবারেই ম্যাড়মেড়ে।

যাই হোক, সেই বারটেন্ডার আমাকে নিয়ে গেল শহরের প্রান্তে এক পুরনো বাড়িতে। দেখে মনে হয় স্প্যানিশরা যখন প্রথম এখানে আসে, সেসময়ের তৈরি। দেয়ালে ফাটল ধরেছে, খিলান আকৃতির দরজার তলা দিয়ে আসছে এক চিলতে হলদে আলো। মস্ত একটা কড়া আছে দরজায়, কেউ এলে ওটা নেড়ে সংকেত দেয়। তিনবার আস্তে করে নাড়ে, দু'বার জোরে জোরে। তা নাহলে খুলবে না দরজা। বারটেন্ডারের কড়া নাড়ার আওয়াজে খুলে গেল দরজা।

ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ধোঁয়া আর গাঁজার গন্ধ। এক কোণে বার কাউন্টার। টেবিলগুলোতে বসে আছে বেশ কয়েকজন লোক। প্রত্যেকেই নেশায় চুর, ডুবে আছে নিজের জগতে। আমরা প্রবেশ করায় একজনও ফিরে তাকাল না। যে অপছন্দের বোধ আমি ভেতরে ঢুকেই অনুভব করলাম, সেটা শুধু রাতের শীতল সুগন্ধী বাতাস থেকে এই দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে প্রবেশের কারণেই নয়, বরং খণ্ড নীরবতার জন্যে; খানিক পর পর যে নীরবতার গলা টিপে ধরছে হিরি রোগীদের মতো চিৎকার আর ফোঁপানি। বিরক্তি উৎপাদন করল আবছা আলো আঁধারি, গাঁজাখোরদের নড়াচড়া, আর চোখের শূন্য দৃষ্টি।

একটা টেবিলে থুতনি ঠেকিয়ে একদম একা বসে আছে কার্ট ব্লোম; দেহটা দু'ভাঁজ। আমাদের এগোতে দেখল নির্বিকার ভাবলেশহীন চেহারায়। নেশায় একেবারে বুঁদ হয়ে আছে। আমাদের আলাপটা জমার কথা, কিন্তু আশঙ্কা হলো অভ্যর্থনাটা হবে ঠাণ্ডা গোছের। পরিচয় পর্বটা কেমন হবে তার ওপরই সব

কিছু নির্ভর করছে। ভয় হলো আমার, ব্লোমকে তার একান্ত জগতে কোণঠাসা করা বোধহয় ঠিক হয়নি। রেমিরেজ যেমন বর্ণনা করেছে কার্ট ব্লোম ঠিক তেমনই; হাজারটা লোকের মাঝে তাকে আলাদা করা যায়। অস্বাভাবিক লম্বা সে, মাথায় চকচকে টাক, চোয়ালের হাড় উঁচু, কোটরে বসা চোখ, পাপড়িগুলো পুড়ে চোখের পাতার কাছে গুটিয়ে গেছে।

ব্লোমের বয়স পঞ্চাশ, কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই পঁয়ত্রিশ না ষাট। চাইনিজদের মতোই, বয়স আঁচ করা যায় না লোকটার। পোশাকে আশাকে গরিবী, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। শক্তি যতটুকু আছে–বেশি আছে বলে মনে হয় না–ঠাঁই নিয়েছে তার চোখে। ধূসর মণির গভীর অতলে জ্বলছে ছোট্ট একটা অগ্নিশিখা, যেকোন সময়ে নিভে যাবে এক ফুৎকারে। আমরা তার টেবিলে বসায় বিস্ময় প্রকাশ করল না সে, ইশারায় ওয়েইটারকে বলল দুটো গ্লাস দিয়ে যেতে। গ্লাস দুটো একেবারে কানা পর্যন্ত ভরে দিল। ব্লোমকে আমি রেমিরেজের কথা বললাম, মনে হলো ধীরে ধীরে নিজের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসছে লোকটা।

'ও, রেমিরেজ,' অবশেষে মুখ খুলল ব্লোম, 'আমি তো ভেবেছিলাম মরে গেছে ও…দেহটা লবণে সংরক্ষণ করা হয়েছে। লোকটা…একেবারে *অ্যাংকোভির মতো।' চমৎকার স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে ইংরেজি বলল ব্লোম। প্যারিসে গেছে সে, যুদ্ধের সময়ে সাতদিন ছুটি কাটিয়েছিল ওখানে। কথাটা জানানোর পরই ফ্রেঞ্চ বলতে শুরু করল সে। একেবারেই বাজে তার ফ্রেঞ্চ। বলল প্লেস পিগালের কয়েকটা নাইট-ক্লাবের কথা, ওখানে চমৎকার একটা বিকেল কাটিয়েছে সে। কথা শেষে ক্ষণিকের জন্যে নীরব হয়ে স্বপ্নে তলিয়ে গেল সে, তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'অর্থহীন যুদ্ধ…'

আধঘণ্টা পর, অ্যালকোহলের কল্যাণে, মনে হলো আমাদের বন্ধুত্বের বয়স নিদেন পক্ষে বিশ বছর। হাঙর শিকার? কোন

* অ্যাংকোভি হচ্ছে কড়া গন্ধযুক্ত হেরিং সম্প্রদায়ের মাছ।

ব্যাপারই নয়। 'কালকে, নাহলে তার পরের দিন,' বলল ব্লোম, 'সাগর যখন শান্ত থাকবে।' টাকা? না, রেমিরেজের কোন বন্ধুর কাছ থেকে কিছু নেবে না সে। তাছাড়া আপাতত টাকার কোন প্রয়োজনও নেই তার, আগামী কয়েক দিনে অন্তত ছয় জন ট্যুরিস্টকে সাগরে নিয়ে যাবে সে। কথা পাকাপাকি হওয়ার পর সন্ধেটা আমি মদের নেশায় কাটিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আবছা ভাবে মনে আছে, মাত্র দু'জন মহিলাই ওই আস্তানায় গাঁজা খাচ্ছিল, কখন যেন তাদের একজন, এক নিগ্রো মুলাটো মহিলা, উঠে গিয়ে বারের পাশে রাখা জুকবক্সে একটা কয়েন ফেলল। বেজে উঠল বাজনা। মদ আর গাঁজার নেশায় চুর হয়ে স্ট্রিপ-টীয নাচতে শুরু করল মহিলা। এটুকু বলতে পারি, ওই নাচ দেখলে কিউবান সেন্সরও বার কয়েক চোখ পিটপিট করত। নাচটা হলো ঘরের শেষ প্রান্তে পর্দা ঘেরা একটা স্টেজে। দর্শক মাত্র একজন। যে আগে জায়গা দখল করতে পারে। পরে আমি জানলাম, পুলিশের ভয় না থাকায় সমাজের উঁচু স্তরের ভদ্রমহিলারা প্রায়ই এই আড্ডাখানায় আসে, উজাড় করে দেয় নিজেকে, বিনে পয়সায়। সেই সন্ধের কথা আমার যতটুকু মনে পড়ে, ভোরের দিকে ব্লোমকে বন্দরে পৌঁছে দিয়েছিলাম আমি, বাড়ি ফিরতে পারবে না, তাই শেষ একশো গজ ওকে বয়ে নিয়ে ওর নৌকোয় তুলে দিতে হয়েছিল।

দু'দিন পর নৌকোতেই ওকে পেলাম আমি, অবশ্য তখন আর ঘুমাচ্ছিল না, ব্যস্ত হয়ে সুতো পরীক্ষা করছিল ব্লোম। সোনালী রোদে ঝকমক করছিল 'হাঙর'। মাত্র ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে ওটাকে।

ভয় হলো আমাকে বোধহয় চিনতে পারবে না, ভুলেই গেছে কি কথা হয়েছিল। কিন্তু কিছুই ভোলেনি ব্লোম। আমাকে দেখে একটা মুখভঙ্গি করল সে, তার ক্ষেত্রে ওটাকেই হাসি বলে ধরে

নিতে হবে। মাথা ঝাঁকিয়ে বন্দরের শান্ত পানির ওপাশে খোলা সাগরের নীল বিস্তৃতির দিকে দেখাল।

'সাগর খারাপ,' বলল ভাঙা ফ্রেঞ্চে। 'মাছ হবে না আজকে। কালকে...হয়তো।'

জেটির শেষ প্রান্তে বসলাম আমি, দেখলাম ব্লোম তার নৌকোর পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। রোদে বসে আছি, আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠছে আমার কাঁধ। ডকের ধারে পাথরে, বা ছোট ক্যাম্প টুলে বসে ছোট মাছ ধরছে পানামা হ্যাট পরা লোকজন। ধৈর্য দেখে মনে হয় অবসর নেয়া ব্যবসায়ী। একটু পর পর ছিপে ঝাঁকি দিচ্ছে তারা, উঠে আসছে না কিছুই।

হঠাৎ, যেন মানুষগুলোকে আশা দিতেই, বন্দরের মাঝামাঝি জায়গায় পানির ওপরে লাফিয়ে উঠল একটা মাছ। মনে হলো ব্লিক মাছ, পাইকের তাড়া খেয়েছে; কিন্তু আসলে তা নয়, এটার ওজন কয়েকশো পাউন্ড। দ্বিতীয় বার যখন লাফাল, যেন অনন্ত কাল ধরে ঝুলে থাকল ওটা কয়েক ফিট ওপরের আকাশে। ওটার ঠোঁট দেখে আমার ধারণা হলো সোর্ডফিশ বা সেইলফিস হবে। মাছটা মাত্র পানিতে পড়েছে, এমন সময়ে একই জাতের সমান আকারের আরেকটা মাছ লাফিয়ে উঠল। আমরা ওদুটোকে লড়াই করতে দেখলাম। তাণ্ডব সৃষ্টি হলো পানিতে, ওদের লেজের ঝাপটায় তৈরি ঢেউ এসে মাথা খুঁড়ল আমাদের পায়ের কাছে।

লাফ দিয়ে জেটিতে নেমে এলো ব্লোম। কাছের একটা ক্যাফের দিকে হাঁটতে হাঁটতে জানাল আরেকটা লড়াইয়ের কথা; কয়েক বছর আগে দেখেছিল, বিরল সে-লড়াই। ব্রাজিলের উপকূলে তখন একটা মাছ ধরা নৌকোয় ছিল ব্লোম। ওর নৌকোর কয়েক দড়ি দূরত্বে পানিতে মাথা তোলে একটা ছোট স্পার্ম হোয়েল। কিছুটা লড়াই দেখতে পেয়েছিল ব্লোম বিনকিউলারের সাহায্যে। স্পার্ম হোয়েলটাকে আক্রমণ করে বসেছিল পাঁচ-ছটা সোর্ডফিশ। চাঁদের উজ্জ্বল রুপোলি আলোয় অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য।

'মনে হচ্ছিল যেন আমি আদিম পৃথিবীতে ফিরে গেছি,' বলল ব্লোম, 'সেই সময়ে, যখন সাগরের দখল পেতে লড়াই করত বিলুপ্ত দানবের দল।'

কয়েক সেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হলো না লড়াই; ডুব দিল তিমি। নৌকো যখন লড়াইয়ের স্থানটিতে পৌঁছুল, মাছগুলোর কোন চিহ্নই নেই। পরদিন ব্লোম নৌকোর অদূরে দেখতে পেল স্পঞ্জের মতো একটা জিনিসের স্তূপ। কৌতূহলী হয়ে কাছে গেল ও; জিনিসটা ধূসর রঙের, গন্ধ একেবারে কস্তুরির মতো। তখন যদি ব্লোম জানত জিনিসটা কি, তাহলে নৌকোর পাটাতনে খুশিতে নাচ জুড়ত। কপাল ভাল যে না জেনেও, স্রেফ কৌতূহলবশত, অদ্ভুতুড়ে জিনিসটা নৌকোয় তুলে আনল ও।

জিনিসটা অ্যাম্বারগ্রিস। স্পার্ম হোয়েলের শরীরে তৈরি হওয়া এক জাতের আংশিক তরল সুগন্ধী পদার্থ। মৃত্যু যন্ত্রণার সময়ে পায়ু পথে অ্যাম্বারগ্রিস বের করে দিয়েছে তিমিটা। অ্যাম্বারগ্রিস ব্যবহার করা হয় দামী পারফিউমে। অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস অ্যাম্বারগ্রিস। যেটুকু ব্লোম পেয়েছিল সেটা বেচে দশ লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক (এক হাজার পাউন্ড) পায় ও।

ব্লোম আমাকে যে ক্যাফেতে নিয়ে গেল, সেখানে অনেককেই ও চেনে। শীঘ্রিই আমি বুঝলাম লোকগুলো পৌর কর দেয়ার মানুষ নয়। তাদের একজন দীর্ঘদিন ধরে সিগারের বাক্স স্মাগলিং করে জীবিকা নির্বাহ করছে। সিগারগুলো গোপনে বিক্রি হয় ইউরোপের উপকূলে। আরেকজনের একটা বোট আছে, মাঝেমধ্যে হাঙর শিকারে বের হয়। কিন্তু আসল কাজ হচ্ছে ঝড়ের পর দ্বীপটাকে চক্কর মারা, যেকোন বিধ্বস্ত জলযান খুঁজে বের করে সম্পদ আহরণ করা। লোকগুলো কোনার একটা টেবিলে বসে আছে, তাস খেলছে নীরবে। একমাত্র আওয়াজ যেটা আছে সেটা কিউবান ডলার নাড়াচাড়া করার।

তাদের থেকে বেশি দূরে নয়, একা একটা টেবিলে বসে আছে বয়স্ক এক লোক; চার্লস রোকা, কিউবার ফিশিং গাইডদের আদিপুরুষ। পরনে তার সাদা ডাক স্যুট আর মাথায় ইয়টিং-ক্যাপ। রোকার বয়স ছিয়াত্তর। বড় মাছ ধরতে প্রতি বছর যারা ক্যারিবীয়ান দ্বীপপুঞ্জে আসে, তাদেরকে ব্লোমের চেয়ে ভালভাবে চেনে সে। বিশেষ করে মাইকেল লার্নার প্রতি বছরই তার সঙ্গে মাছ ধরে। তার সঙ্গেই রেমন্ড লোয়ি সেই সোর্ডফিশটা ধরেছিল, যেটা নৌকোর পাশে আসার আগে অন্তত একশোটা লাফ দিয়েছিল। আরও কত ঘটনা, কত গল্প যে রয়েছে তার; সব-কথা বলতে গেলে আলাদা বই লিখতে হবে।

রোকা যখন মাছ ধরার কথা বলে, চকচক করে ওঠে ওর চোখ; পার্চমেন্ট কাগজের মতো কোঁচকানো গালে সজীবতার ছোঁয়া লাগে; সুবাতাস বয়ে যায় ওর অন্তরে, যেন পূর্ণতা পায় সে, এমনকি চামড়ার ভাঁজগুলো পর্যন্ত মোলায়েম হয়ে আসে।

'হেমিংওয়ে আগে প্রায়ই আমার সঙ্গে মাছ ধরতে আসতেন,' বলল সে, 'তারপর একদিন তিনি নিজেই পিলার নামের একটা নৌকো কিনলেন। অবশ্য এখন আর তিনি মাছ ধরেন না, বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন।'

গতবছর রোকার নৌকো 'কেইম্যানে' দুই সপ্তাহ ছিল লার্নার। পঞ্চাশটারও বেশি মাছ ধরেছে। সুতো ছিঁড়ে পালিয়েছে সমান সংখ্যক। মাছের জোরের কারণে সুতো ছিঁড়ে যাওয়াটা সব মৎস্যশিকারীর কাছেই এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন।

'ক্যারিবীয়ানে শিকার শুরুর পর থেকে যত সুতো আমি হারিয়েছি, সেগুলো যদি একসঙ্গে গিঁঠ দেয়া যায়,' বলল চার্লস রোকা, 'সারা পৃথিবী এক চক্কর ঘুরিয়ে আনা যাবে। মার্লিন, হাঙর, সেইলফিশ আর টিউনা–যেগুলোর মুখে এখনও আমার হুক আটকে আছে, সেগুলোকে এক জায়গায় স্তূপ করলে একটা আস্ত পাহাড় বানাতে পারবেন। কখনও কখনও এমনও হয়েছে, মাছ

ধরে দেখেছি এক বছর বা দুবছর আগে ওই একই মাছে আমার হুক বিঁধিয়েছিলাম। সেই হুক রয়ে গেছে তখনও । সঙ্গে কয়েক গজ সুতো।' আমার দিকে তাকাল রোকা। 'মাছ যতক্ষণ পানির ওপরে খেলছে, আপনি মোটামুটি নিশ্চিত থাকতে পারেন, আগে হোক পরে হোক ওটাকে ঠিকই তুলে আনতে পারবেন। কিন্তু যদি ওটা ডুব দেয়, ধরে নিতে পারেন যে চার-বারের মধ্যে তিন বারই আপনাকে হুক হারাতে হবে।'

সেদিন গরম বাতাস সাগরকে উন্মাতাল করে রেখেছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল বাতাস। দু'দিন পর সাগর-যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলো 'হাঙর'।

সমুদ্রের যেখানে মাছ ধরা হয় সেখানে আমরা যখন পৌঁছুলাম, পুব দিগন্তের খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে রক্তলাল সূর্য। চকচক করছে সাগর, ইতিমধ্যেই গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে পরিবেশ। উড়ুক্কু মাছের দল যদি মাঝেমধ্যে লাফ দিয়ে বাতাসে শরীর ভাসিয়ে না দিত, সাগরকে মনে হতো মৃত। যেদিকে তাকানো যায় একটা পালও নেই। মাছের একটা পাখনাও দেখলাম না।

অর্ধেক গতি তুলে এগিয়ে চলেছে নৌকো। পেছনে লম্বা দড়িতে বাঁধা আছে পেন্সিল-বক্সের সমান একটা কাঠের টুকরো, পানিতে সরু একটা রেখা তুলে লাফাতে লাফাতে পেছন পেছন আসছে ওটা। মাছকে আকৃষ্ট করার জন্যে ওটা ব্যবহার করা হয়। ডেক-হাউজ থেকে ছিপগুলো বের করে আনল ব্লোম। কাঠের টুকরোর দু'পাশে, কয়েক ইঞ্চি নিচে আমাদের বড়শি দুটো। বোঝা যায় না ওগুলো বড়শি, এমনভাবেই রঙবেরঙের পাখির পালক দিয়ে ঢাকা।

শুরু হলো আমাদের প্রতীক্ষার পালা।

খালি গা, ছিপের ওপর ঝুঁকে বসে আছে ব্লোম। চোখ দুটো অর্ধ নিমীলিত। দেখে মনে হয় ঘুমাচ্ছে। কিন্তু খেয়াল করলে

বোঝা যায়, সরু চোখের ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পেন্সিল-বক্স আর ওটার তৈরি ফেনার দিকে চেয়ে আছে, নজর সরছে না মুহূর্তের জন্যে।

তৃতীয় আরেকজন রয়েছে আমাদের নৌকোয়। চ্যাটো, পনেরো বছরের এক নিগ্রো বালক। হুইলের দায়িত্বে আছে সে। বড় একটা বৃত্ত তৈরি করে নৌকোটা চালাচ্ছে। ওকে বলা আছে, মাছ টোপে ঠোকর দিলেই এঞ্জিন বন্ধ করে দেবে সে।

পাঁচ, দশ, পনেরো, তারপর বিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। এক তিল নড়ছে না ব্লোম।

সূর্যের আলোয় পুড়তে শুরু করেছে আমার কাঁধের চামড়া। সান-গ্লাস কোন কাজে আসছে না, চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি। বড়শিটা আমি হারিয়ে ফেললাম। খুঁজে পেলাম একটু পরে। তারপর আবার চোখের আড়ালে চলে গেল ওটা। চোখ ঝলসানো এই সোনালী-নীল সাগরের অতল থেকে কোন্ জন্তু উঠে আসবে প্রথমে? লাল টিউনা? কোন সেইলফিশ? সাইরেন? সোর্ডফিশ ধরতে পারার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, কারণ ওই মাছ শুধু রাতেই ধরা যায়। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল ব্লোম।

'দেখুন! আপনার হুকের ছয় ফিট দূরে, বাম দিকে।'

পানিতে হঠাৎ চাঞ্চল্য, ফেনার সরু একটা রেখা—কিছু একটা বড়শির পিছু ধাওয়া করেছে। চ্যাটোকে ইশারা করল ব্লোম। গতি কমে গেল নৌকোর। এখন যেকোন সময়ে ঠোকর দেবে মাছ।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। খুব দ্রুত নৌকোর গতি কমিয়ে ফেলেছে চ্যাটো। বিরাট মাছটা বড়শি ছাড়িয়ে এগিয়ে এলো সামনে। তারপর অবাক হয়ে নৌকোর পেছনে পেছনে সাঁতার কাটল কিছুক্ষণ।

আবার এঞ্জিন চালু করল চ্যাটো। তিন সেকেন্ড পর, আমাদের অবাক করে বড়শি গিলে ফেলল মাছটা। পানিতে কোন আলোড়ন দেখলাম না। হাতের ছিপে শুধু অনুভব করলাম মৃদু শিহরণ।

কির্‌কির্‌ শব্দে হুইল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সুতো. তা নাহলে আমি বুঝতাম না কি ঘটছে। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলাম আমি তারপর সুতোটা একটু ঢিল পড়তেই হুইল আটকে ঝাঁকি দিলা ছিপে।

হাতে পাল্টা যে ঝাঁকি লাগল, তাতে আটকে রাখা শ্বাস বেরিয়ে গেল আমার। তিরিশ সেকেন্ড পর সুতো গুটিয়ে ফেললাম: হুকের কয়েক গজ আগে ছিঁড়ে গেছে সুতো। বিশাল মাছটা পেটের মধ্যে বড়শি নিয়ে তলিয়ে গেল সাগরে।

'আপনি খুব দ্রুত ঝাঁকি দিয়েছেন,' আফসোসের সঙ্গে মন্তব্য করল ব্লোম। 'ঝাঁকিতে জোরও ছিল বেশি।'

কয়েক মিনিট পর আবারও ঠোকর দিল মাছ। এবার ব্লোমের বড়শিতে। হিট করল ব্লোম। শুরু হলো দীর্ঘ খেলা।

আমার মনে হলো অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ। মেট্রোনমের মতো নিয়মিত ছন্দে ছিপ ওঠাচ্ছে নামাচ্ছে ব্লোম। ছিপ যখন নামিয়ে সাগরের দিকে তাক করছে, সুতো গোটাচ্ছে সেসময়ে। মাছ যখন টান দিচ্ছে, কয়েক গজ সুতো ছাড়তে ভুলছে না। তারপর আবার মেট্রোনমের কাজ করছে ওর হাত। খেলার একটা পর্যায় আসে যখন শিকারী আর মাছ মুখোমুখি হয়। শিকারীর সাধ্য নেই এক ইঞ্চি সুতো গোটায়, আর মাছেরও সাধ্য নেই সুতো টেনে নিয়ে যায়। তারপর একসময়ে ধৈর্যের পুরস্কার মেলে, হাল ছেড়ে দেয় মাছ।

রীলে সুতো গুটিয়ে দেখছি আমি প্রাক্তন মুক্তো-শিকারীকে, ক্লান্ত মাছটাকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে আসছে নৌকোর কাছে। আরও সরু হয়ে গেছে ব্লোমের চোখ। বাম চোখের নিচে লাফাচ্ছে মাংস পেশি। পরিশ্রমে নাকি উত্তেজনায়? অনেকবার আমি ভেবেছি কেন এই লম্বা, শুকনো গোছের লোকটা কিউবাতে বাস করছে; জবাবটা সম্ভবত ওই কম্পনরত মাংস পেশিতে লুকানো আছে। মাংস পেশিতে আর গাঁজায়। পরে ওকে আমি জিজ্ঞেস

করেছিলাম, কখনও সে জার্মানিতে ফিরে যাবে কিনা। মনে আছে, জবাবে ও বলেছিল, ক্যারিবীয়ান যদি ওখানে চলে যায় তো যাবে ও জার্মানিতে; তা না হলে নয়। জার্মানিতে জীবনের খুব অল্প সময়ই কাটিয়েছে ও। ওর বাবা ডাসেলডর্ফে বিমান আক্রমণের সময় মারা যায়। জার্মানিতে আর কেউ নেই ওর। ব্লোমের জুতোর তলাটা দড়ির তৈরি। ওটা দিয়ে ডেকে পা ঠুকে ফ্রেঞ্চে বলেছিল, 'মাছ-শিকার ছাড়া বাঁচব না—বুঝলেন? ব্যাপারটা জুয়ার মতন, আপনি জানেন না সাগরের তলা থেকে কি উঠে আসবে। তিন বছর আগে এক হাজার পাউন্ড ওজনের একটা হাঙর ধরেছিলাম আমি। এখন অপেক্ষা করছি, কবে ধরতে পারব দেড় হাজার বা দুই হাজার পাউন্ডের হাঙর।...'

আধঘণ্টা লড়াই করে সেদিন যে মাছটা ও তুলে আনল, সেটা মাত্র তিনশো পাউন্ডের। এরপর আরও তিনটা মাছ ধরা হলো আমরা সকালের শেষে বন্দরে ফিরে আসার আগে। ধরল ব্লোম; কারণ প্রথম মাছটা ছুটে যাওয়ার পর আমার বড়শিতে আর একটা মাছও ঠোকর দেয়নি।

বিকেল তিনটের সময়ে আবার আমরা চলে এলাম তীর থেকে ছয় মাইল দূরের খোলা সাগরে। চারটের সময় ডেকে পড়ে থাকল একটা হাঙর আর একটা সেইলফিশ। সপ্তম বারের মতো আবার বড়শি ফেলল ব্লোম।

পাঁচটার দিকে আমি বুঝে গেলাম, যতই মনোযোগ দিয়ে আমি সাগর আর বড়শির দিকে তাকিয়ে থাকি না কেন, আজকে আমার কপালে মাছ নেই।

এখন এক নাগাড়ে বড়শিটাকে আমি প্রায় এক মিনিট নজরে রাখতে পারছি। ব্লোমকে অনুরোধ করলাম যাতে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে ও আমার জায়গায় বসে। আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। তারপর আমার ছেড়ে যাওয়া ছিপ দিয়ে পাঁচশো পাউন্ডের একটা সোর্ডফিশ তুলল ব্লোম।

কোন এক গল্পে এক লুটেরার কথা বলেছিলেন হেমিংওয়ে। লোকটা টরটুগা দ্বীপের কাছে একটা ডুবন্ত লাইনার খুঁজে পেয়েছিল। পাথর প্রাচীরে বাড়ি খেয়ে লাইনারটা বিধ্বস্ত হয়। এতই দ্রুত ডুবেছিল যে সলিল সমাধি হয়েছিল যাত্রীদের। মাত্র আট-দশ ফ্যাদম নিচে ছিল জাহাজটা। লুটেরা ডুব দিল জাহাজে। একটা স্টেটরুমে ছিল এক মহিলার লাশ, পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল লোকটা। পানির আন্দোলনে দোল খাচ্ছিল মহিলার লম্বা চুলের গোছা। আঙুলে ছিল বড় একটা হীরের আঙটি।

পোর্টহোল বন্ধ দেখে উঠে এলো লুটেরা। নৌকো থেকে পোর্টহোলের কাঁচ ভাঙার মতো একটা কিছু নিয়ে আবার ডুব দিল। কোন হাঙর এলো না তাকে বিরক্ত করতে, কিন্তু পোর্টহোলের কাঁচটা ছিল মাত্রাতিরিক্ত পুরু। যন্ত্রপাতি আনতে হাভানায় গেল লোকটা। ফিরে এসে দেখল তার অনুপস্থিতির সময়ে অন্যান্য ডুবুরিরা জাহাজের বেশিরভাগটাই খালি করে ফেলেছে।

জাহাজ ডোবার কয়েক দিন পর থেকে ওদিকের পানিতে একটা হাঙরও ধরা পড়েনি। পরবর্তী দু'এক সপ্তাহ একটা হাঙরও চোখে পড়েনি কারও কয়েক মাইলের ভেতরে। যেন ওই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে ওরা, ঈশ্বর জানেন কোথায়।

আসলে জাহাজে ঢুকেছিল হাঙরের দল, জাহাজের হালের নিচের একটা ফাটল দিয়ে। ভেতরে পচে ওঠা মৃতদেহ সাবাড় করছিল নিশ্চিন্তে।

বড়শির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গল্পটা মনে পড়ল আমার। মনের মাঝে সন্দেহের দোলা লাগল, তেমন কিছু এখানে ঘটেনি তো? কোথাও হয়তো সাগরের গভীর অতলে, বালু আর সামুদ্রিক আগাছার বিছানায়, শুয়ে আছে একটা জাহাজ, যাত্রীদের পেটের ভেতরে নিয়ে।

মাঝে মাঝে হাজির হচ্ছে এক আধটা হাঙর, ব্লোমের বড়শিতে ঠোকর দিয়ে গায়েব হয়ে যাচ্ছে, বিরক্ত আর হতাশাগ্রস্ত করে তুলছে আমাকে।

শেষ পর্যন্ত ডুবল সূর্যটা। রোদে তেতে ওঠা দুটো তরমুজ বের করে দিল চ্যাটো। ওগুলো দিয়ে পিপাসা মেটালাম আমরা। সাগরের বুকে আঁধার নামল। হুইলে সুতো গুটিয়ে নিল ব্লোম। বন্দরে ফিরে চলল 'হাঙর'।

তখনও জানি না, আগামী কাল মাঝরাতের খানিক পর জীবনের প্রথম সোর্ডফিশটা ধরব আমি।

চার

পরের সারাটা দিন সাগর রইল লেকের মতো শান্ত। ঠিক সময়ে, একটুও দেরি না করে, 'হাঙর' নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা বন্দর ছেড়ে। বিকেলটা ব্লোম কাটিয়েছে সেই পরিচিত ক্যাফেতে, সিগার-ব্যবসায়ী আর ধ্বংস-স্তূপ-সন্ধানীর সঙ্গে পোকার খেলে। কথা ঠিক হয়ে আছে, হয় সকালে নাহয় রাতে মাছ ধরতে সাগরে বেরব আমরা।

সকাল সাতটা থেকে দুপুর পর্যন্ত বড়শি গিলল শুধু সেইলফিশ। ওগুলোকে আমরা ছেড়ে দিলাম, কারণ বাজারে সেইলফিশের কোন দাম নেই। ব্লোম কয়েকটা সঙ্গে করে তীরে নিয়ে এলো, পরবর্তীতে টোপ হিসেবে ব্যবহার করবে, অথবা বিড়ালের খাবার।

সেইলফিশ নিরীহ দানব। সবচেয়ে বড়টা দশ থেকে বারো ফিট লম্বা। ওগুলো ছেড়ে দেয়ার সময় নৌকোর পাশে ঝুঁকল চ্যাটো, গ্লাভ পরা হাতে বোঁচা ঠোঁট ধরে ছাড়িয়ে নিল বড়শি। বোকা হয়ে যায় সেইলফিশ হঠাৎ ছাড়া পেলে। নৌকোর পাশেই ভেসে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে ফিরে যায় পানির গভীরে।

কখনও কখনও টোপ গিলে ফেলে ওরা, তখন মাছটাকে না মেরে আর কোন উপায় থাকে না। মুগুরপেটা করার পর নৌকোয় তুলে আনি, ছুরি দিয়ে গলা চিরে বড়শি বের করে চ্যাটো। বড়শির সঙ্গে বেরিয়ে আসে কালচে রক্তের সরু ধারা। পানির ওপরে ওঠালেই রহস্যজনক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নিজেদের শরীরের রং পাল্টে ফেলে সেইলফিশ। লম্বা কালো শরীরটা হয়ে যায় রংধনুর সাতরঙা। শরীর শুকালে দেখতে লাগে ইস্পাতের মতো।

সেইলফিশ বড়শি গিললে সে যত বড় মাছই হোক আর যত বাধাই দিক, ঠিকই আমরা নৌকোর পাশে নিয়ে আসতে পারি। কিন্তু হাঙর বা সোর্ডফিশের বেলায় তেমন কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রায়ই সুতো ছিঁড়ে দু'পাশের পানি কেটে ডুব দেয় হাঙর। কয়েকশো কিলোর কোন হাঙরকে টেনে তুলে আনা রেল এঞ্জিন ওঠানোর মতোই অসম্ভব কাজ। আমার মনে আছে, ব্লোমকে একদিন দেখেছিলাম দু'ঘণ্টারও বেশি একটানা লড়াই করতে। মনে হয়েছিল বড় আকারের হাঙর হবে। আরও দশ মিনিট পর সমস্ত কৌশল খাটিয়ে পানির কয়েক ফিট নিচে হাঙরটাকে নিয়ে আসতে পারল ব্লোম। সুতো তখন টানটান হয়ে গেছে, কাঁপছে তিরতির করে; যেকোন সময়ে ছিঁড়ে যাবে। তারপর এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে সুতো টেনে নিল হাঙরটা, আর ওটাকে তোলা গেল না।

রাতে মাছ-শিকার সেই তুলনায় সফল। ব্লোমের সঙ্গে চুক্তি আছে এক ফ্যাক্টরি মালিকের, মাছ কিনে বিক্রয়যোগ্য অংশ

বাজারে বিক্রি করে লোকটা। মাছ ধরে ফেরার পর একটা ভ্যান থামে বন্দরের জেটিতে, ব্লোমের নৌকোর পাশে; নিয়ে যায় আমাদের রাতের শিকার, পাঁচ-ছয়টা হাঙর বা সোর্ডফিশ। প্রতিরাতেই আমরা দু'তিনটে করে সোর্ডফিশ ধরি, কাজেই সপ্তাহ শেষে বেশ ভাল টাকা জমে যায় ব্লোমের হাতে।

মাঝে মধ্যে একটা দুটো টিউনাও ধরা পড়ে। তখন আমরা সরাইখানায় বসে এক সঙ্গে তিনটে হুইস্কির অর্ডার দিই। তবে, তেমন ঘটনা খুব কমই ঘটে। বসন্ত এখনও আসেনি; বসন্তে আসে লাল টিউনা, ক্ষুধার্ত আর রুগ্ন, ওজন বড় জোর তিনশো পাউন্ড; সরে যেতে থাকে কানাডার উত্তর উপকূলের দিকে; সঙ্গে থাকে টিউনার চিরকালের সঙ্গী, ঝাঁকে ঝাঁকে হেরিং, কড ইত্যাদি ছোট মাছ। এখন বড় মাছ ধরার মৌসুম নয়, সৌখিন আমেরিকান মৎস্যশিকারীর দল তাই এখনও ক্যারিবীয়ানে আসেনি। টিউনার সঙ্গে সঙ্গে আসে তারা। তবে মৌসুম না হলেও মাঝে মধ্যে একটা দুটো টিউনা আমাদের ছিপে ধরা ঠিকই পড়ছে।

এক সকালে ব্লোমকে দেখলাম বন্দরে, এক লোকের সঙ্গে আলাপ করতে। প্রাক্তন ইন্ডিয়ান কর্নেল, পরনে সাদা স্যুট আর মাথায় মস্ত পানামা হ্যাট। লন্ডন থেকে মাত্র এসেছেন ভদ্রলোক, দু'এক দিন থাকবেন; ইচ্ছে ছিপ দিয়ে বড় মাছ ধরেন। 'মিস্টার হ্যামারস্টক,' আমার দিকে ফিরে দ্রুত একবার চোখ টিপল ব্লোম। পরিচয় করিয়ে দিল। 'এই যে আমার সহকারী, মিস্টার পোলি। ফরাসী মানুষ।'

কর্নেলের চোখে মুহূর্তের জন্যে বিস্ময় খেলে গেল। এক জার্মান আর এক ফরাসীর সঙ্গে মাছ শিকারে যাবেন তিনি! জাতিগত শত্রুতা অভিযানপ্রিয়তার কাছে হার মেনেছে, সন্দেহ কি!

'মন ফ্যামি,' বললেন মিস্টার হ্যামারস্টক। স্কুলে তিনি ফ্রেঞ্চ ভাষাটা শিখেছেন। দুঃখজনক যে তাঁর মন থেকে ফ্রেঞ্চ ভাষা একেবারে মুছে যায়নি। বললেন, 'আমি যখন মাছ তুলব, আমার

স্ত্রী, সে তখন ছবি তুলতে চায়। সেটা সম্ভব হবে কি?' তাঁকে নিশ্চিন্ত করা হলো। বাউ করলেন হ্যামারস্টক। 'তাহলে কথা রইল এই। আমি যাই বলি তাকে তৈরি হতে। দু'জনই ফিরব এক মিনিটের মধ্যে।'

তা তাঁরা ফিরলেন। দু'জনই পরে আছেন হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হাফ-প্যান্ট। গায়ে সবুজ আর হলুদ ফুলের ছাপ দেয়া শার্ট। মিস্টার হ্যামারস্টকের মাথায় আই-শেড দেয়া ক্যাপ। মিসেসের হাতে ছবি তোলার বিভিন্ন সরঞ্জাম। থলথলে ঢাউস বুকের চারধারে হরেক দৈর্ঘ্যের স্ট্র্যাপ। তাতে বাঁধা আছে ক্যামেরা আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি। যতরকম ভঙ্গি থাকতে পারে সবগুলো ভঙ্গিতে স্বামীর ছবি নিলেন মহিলা। মিস্টার হ্যামারস্টক নৌকোয় উঠছেন, নৌকোয় বসছেন, হুইলে সুতো গোটাচ্ছেন, পানিতে বড়শি ছুঁড়ছেন, পেছন আর সামনে থেকে ছবি তোলা হলো, পাশ থেকেও বাদ গেল না, হ্যামারের চোয়াল তখন দৃঢ়বদ্ধ, শক্ত হয়ে গেছে দেহের সমস্ত পেশি, চোখ সরু করে তাকিয়ে আছেন দিগন্ত বিস্তৃত নীল সাগরের দিকে। মিসেস হ্যামারস্টক নৌকোর এপ্রান্তে ওপ্রান্তে ছুটে গিয়ে স্বামীর ছবি তুলছেন; ব্লোমের নৌকো দুলছে, যেন প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়েছে। গলায় একটা রুমাল পেঁচিয়েছেন মহিলা, চোখে বিরাট কালো গগল্‌স্। চামড়ার ঝালর তাতে। দেখতে লাগছে যুদ্ধের বার্তা-বাহকের মতো।

সেদিন সকালে একটা মাছও ঠোকর দিল না মিস্টার হ্যামারস্টকের বড়শিতে। নৌকো আজকে যেখানে আছে সেখানে আগে আমরা কখনও মাছ ধরিনি। এ এমন এক জায়গা, যেখানে পিচ্চি একটা হাঙর পাবার সম্ভাবনাও প্রায় নেই বললেই চলে। ব্যাপারটা আমি জানি। আমার চেয়ে ভাল জানে ব্লোম। ও ঠিক করেছে কালকের আগে হ্যামারস্টককে হাঙর শিকার করতে দেবে না। একটা দিন হ্যামারস্টক বেশি থাকলে চল্লিশ ডলার বাড়তি আয় হবে ওর।

আমি শুনেছি, আফ্রিকার কোন কোন জায়গায় সাফারি গাইডরা বিশেষ এক কৌশল খাটায়। নির্দিষ্ট একটা জায়গায় প্রতিদিন মাংস রেখে সিংহদের আকৃষ্ট করে ওরা। মাংস রাখার পর নিয়মিত হুইস্‌ল্‌ বাজায়। প্যাভ্‌লোভ্‌স্‌ রিফ্লেক্স অনুযায়ী, অভ্যেস বশে, বাঁশি শুনলেই সিংহ মনে করে খাবার দেয়া হয়েছে। যেখানেই থাকুক, চলে আসে সেই নির্দিষ্ট জায়গায়। যেদিন গাইড মনে করে আজকে শিকারীর রাইফেলের রেঞ্জে একটা সিংহ আনা দরকার, সেদিন জায়গা মতো নিজের একজন লোক পাঠিয়ে দেয় সে। হুইস্‌ল্‌ বাজায় সেই লোক। অভ্যস্ত সিংহের দল চলে আসে খুন হতে।

এই কৌশলের শিকার আমাকে হতে হয়নি কখনও, কিন্তু কার্ট ব্লোমের কৌশল নিঃসন্দেহে কাজে এলো; কারণ পরদিন আরও চল্লিশ ডলার খরচ করে হাঙর শিকার করতে এলেন হ্যামারস্টক।

'দু'মাস পরে নৌকো নিয়ে আমরা দ্বিতীয়বার খোলা সাগরে যাবার সময় বললেন হ্যামারস্টক, 'কি করব আমি জানেন? লন্ডনে, ক্লাবে গিয়ে বন্ধুদের ছবিগুলো দেখাব। বড় মাছের পাশে দাঁড়িয়ে আমি, এই ছবি দেখার পর রোববারে নদীতে গিয়ে কে কখন চার পাউন্ডের ট্রাউট ধরেছে, সে-কথা বলে আমাকে আর বিরক্ত করে মারতে পারবে না ওরা।'

দ্বিতীয় দিন খুব ভোগান্তি হলো মিস্টার হ্যামারস্টকের রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। সী-সিক সাগর অত্যন্ত অশান্ত, সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রখর সূর্যের উত্তাপ। স্যুইভেল চেয়ারে বসে আছেন হ্যামারস্টক, ঘামছেন অবিরত, চোখ হয়ে গেছে ঘোলা, বাঁকা হয়ে আছে ক্যাপ, শেষ চেষ্টার জন্যে তৈরি হয়ে গেছেন তিনি, আরও চল্লিশ ডলার খরচ করে তৃতীয়বার আসার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। একটা সেইলফিশ ধরার আগে কিছুতেই হার স্বীকার করবেন না তিনি।

দানবটা যখন হ্যামারস্টকের বড়শিতে গাঁথল, মিসেস হ্যামারস্টক ছোঁ দিয়ে তুলে নিলেন তাঁর সেরা ক্যামেরা। একের পর এক ছবি তুলতে লাগলেন। তিনটা ক্যামেরা সঙ্গে এনেছেন তিনি। ডেকের সঙ্গে মাছটা যখন বাঁধা হলো, ব্লোমের দিকে ফিরলেন মিস্টার হ্যামারস্টক, অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে জানালেন যে এবার বন্দরে ফেরার সময় হয়েছে। দুটো দাঁত উপড়ে নেয়ার পর দাঁতের ডাক্তারকে রোগী যেভাবে শুভ বিদায় জানায়, ঠিক তেমনি করেই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন তিনি। '...আর আমি আশা করব জীবনেও যেন আপনাদের সঙ্গে আমার কখনও দেখা না হয়,' চোখ বড় বড় করে বললেন হ্যামারস্টক। ততক্ষণে মুখে কিছুটা রং ফিরেছে তাঁর। বাউ করা শেষে আমাদের সঙ্গে হাত মেলালেন তিনি।

কয়েকদিন পরে ট্রপিকানায় তাঁকে দেখলাম আমি; একটা টেবিলে বসে হুইস্কি গিলছেন, ঘোলা চোখে দেখছেন অনুষ্ঠানমালা।

'আমার সঙ্গে মাছ ধরার ব্যাপারে কথা বলবেন না,' গোমড়া মুখে আমাকে বললেন তিনি। 'মাছ ধরার কথা শুনলে তালাকের কথা মনে আসে। জানেন, ছবিগুলোর কি অবস্থা হয়েছে? সব ফাঁকা। ছবি তোলার আগে লেন্সের কাভার খুলতে ভুলে গিয়েছিল আমার স্ত্রী!'

কয়েক দিন পর, আমাদের 'হাঙর' থেকে কয়েক দড়ি দূরত্বে একটা নৌকো দেখলাম আমরা। দু'জন ডুবুরি আছে নৌকোটায়। কাছে গেলাম। কিউবার এক স্যালভেজ কোম্পানির নৌকো। যে জায়গায় নোঙর ফেলেছে, সেখানটা তীর থেকে কয়েক মাইল দূরে। পানির গভীরতা মাত্র পাঁচ ফ্যাদম। এখানে সাগর তলের বালি আর আগাছার বিছানায় শুয়ে আছে 'হাঙরের' সমান একটা নৌযান।

'ওটা স্যান কার্লোস,' আমাকে বলল ব্লোম। 'ক্যাফেতে গতরাতে যে-লোকটাকে দেখলেন, হুয়ান কর্ডোগ্না; সে-ই ওটার মালিক।'

ছয় মাস আগে টর্নেডোর কবলে পড়ে কর্ডোগ্না। সঙ্গে ছিল তার ছেলে আর আরেকজন লোক। সাধারণত টর্নেডো এড়িয়ে চলা যায়, কিন্তু বিশেষ এই টর্নেডোটি এত দ্রুত এবং প্রচণ্ডতায় আঘাত হানে যে স্যান কার্লোস বন্দরে ফেরার কোন সুযোগই পায়নি। খুবই পুরনো নৌকো স্যান কার্লোস, এঞ্জিনটার এমনই অবস্থা যে শান্ত সাগরেই শুধু কর্মক্ষম। ঝড়ে পড়ার কিছুক্ষণ পরই ফুটো হয়ে গেল স্যান কার্লোসের খোল। এক ঘণ্টাও আর ভাসতে পারবে না বুঝে ছেলে আর যাত্রীর সহায়তায় নৌকোর কয়েকটা তক্তা খুলে ফেলল কর্ডোগ্না, দড়ি দিয়ে সেগুলো বেঁধে তড়িঘড়ি করে একটা ভেলা বানাল। কার্লোসে দুটো লাইফ বেল্ট ছিল। সেগুলো যাত্রীদের দিল সে। ওর ছেলের বয়স বারো, আর অন্য লোকটা ছিল বয়স্ক। তিনজনই ওরা ভেলায় উঠে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিল নিজেদের। ওরা ভেলায় ওঠার কয়েক মিনিট পরই ডুবে গেল স্যান কার্লোস। খোলা সাগরে ঝড়ের ভেতর একদিন একরাত ভেলায় কাটল। দিনের শেষে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ, গড়িয়ে পড়ে গেল ভেলা থেকে। পুরো ডুবল না দেহ। কোমরের নিচ থেকে বাঁধা ছিল ভেলার সঙ্গে। ভেলার শেষ প্রান্তে, কর্ডোগ্না আর ওর ছেলের কাছ থেকে দশ ফিট দূরে নিজেকে বেঁধেছিল সে। তার একটা পা আটকে গিয়েছিল দুটো তক্তার ফাঁকে।

'কর্ডোগনা আমাকে বলেছে কিছুই করার ছিল না ওর,' বলল ব্লোম। 'বৃদ্ধকে সাহায্য করতে চাইলে নিজের দড়ি কেটে এগোতে হতো ওকে। ধরার মতো কিছু ভেলায় ছিল না। ও বলেছে, "আমার ছেলে আমাকে জড়িয়ে ধরে ছিল।"'

বাতাস যখন পড়ল, তখনও আধাডুবন্ত অবস্থায় ভেলার সঙ্গে

রয়ে গেছে বৃদ্ধের লাশ। এবং এবার এলো হাঙরের দল।

হাঙর যখন আক্রমণ করে, বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে আসে শিকারের দিকে। সী-স'র মতো উঁচু-নিচু করে দেহ, তারপর চোয়াল বন্ধ করে শিকারের গায়ে; কেটে নিয়ে যায় এক খণ্ড মাংস। সী-স'র মতো করার কারণ, হাঙরের মুখ ঠিক সামনের দিকে থাকে না, মুখটা থাকে নিচে এবং কয়েক ইঞ্চি পেছনে। কর্ডোগ্না আর তার ছেলে কয়েক ঘণ্টা ধরে হাঙরের তাণ্ডব দেখতে বাধ্য হলো। দেখল বার বার ঝাঁকি খাচ্ছে বুড়োর দেহ।

ততক্ষণে সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে এসেছে ওদের। কিছু যে করবে সেই উপায় নেই। দড়ি দিয়ে তক্তা বাঁধা ভেলাটা কি করে যে এই অশান্ত সাগরে টিকে আছে সেটা এক বিস্ময়। মৃতদেহটার উপস্থিতি একই সঙ্গে স্বস্তিদায়ক এবং বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। লাশটা হাঙরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, ওটার রক্তের গন্ধে ছুটে আসছে আরও হাঙর। ভেলার চারপাশে অনবরত ঘুরছে অন্তত ছ'টা। আকারে ওগুলো ছোট, কিন্তু বুঝতে কর্ডোগ্নার দেরি হলো না যে বড়গুলোও যেকোন সময়ে হাজির হয়ে যেতে পারে। বয়স্ক কোন হাঙর যদি দেহটা কামড়ে ডুব দেয়, তাহলে নিঃসন্দেহে ডুবে যাবে এই খুদে ভেলা। শরীরে বাঁধা দড়িটা কেটে সাবধানে এগোল কর্ডোগ্না, লাশটা ফেলে দিল ভেলা থেকে। কিছুক্ষণ পরই একটা হাঙরও রইল না চারপাশে।

কয়েক ঘণ্টা পর কর্ডোগ্না আর তার ছেলেকে উদ্ধার করল একটা নৌকো। ছেলেটা তখন অজ্ঞান।

'প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছিল ছেলেটা,' বলল ব্লোম, 'আর কর্ডোগ্না এখনও নিজেকে সামলে নিতে পারেনি। নৌকোডুবির পর কেমন যেন ঘোরের মধ্যে বাস করে, সেই ঘটনার পর আর কোন নৌকোয় পা রাখেনি আজ পর্যন্ত।'

তাকিয়ে থাকলাম আমরা, হাঙরের হাত থেকে বাঁচার জন্যে একটা লোহার খাঁচায় করে নিচে নামছে ডুবুরীরা। মনে প্রশ্ন

জাগে, কি খুঁজছে ওরা স্যান কার্লোসে? *কীলের সীসে?

কার্লোস প্রায় পুরোটাই ঢাকা পড়ে গেছে ঘন আগাছা আর ঝিনুক-শামুকে। সাগরে ডুবে যাওয়া ধনরত্নের বেশিরভাগই তলিয়ে গেছে ক্যারিবীয়ানের সমুদ্রে। ডুবন্ত জাহাজগুলোর সঙ্গে যোগ দিল আরও একটি বিধ্বস্ত নৌযান।

স্যান কার্লোস যেখানে ডুবেছে, সেখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে হঠাৎ করেই কয়েকশো ফ্যাদম গভীরতায় নেমে গেছে সাগরের মেঝে। সরু গভীর খাঁজগুলোতে আছে ডুবন্ত জাহাজ, হাতের নাগালের বাইরে। ওখানে যেতে পারলে ডুব দেয়াটা লাভজনক হতো।

স্যান কার্লোসের চারপাশের এক মাইল সাগরে কত রত্ন লুকিয়ে আছে? কয়েকশো বছর আগে সোনার মোহর ভরা কটা গ্যালিয়ন ডুবেছিল এখানে? আর কারও যাওয়ার সাধ্য নেই, হাঙর এখন নিঃশব্দে ভেসে বেড়ায় ওগুলোতে।

একটা কথা ঠিক, কোজিমারের হতদরিদ্র জেলেদের প্রত্যেকেই জীবনে অন্তত একবার বিপুল সম্পদের খুব কাছে পৌঁছেছে।

'যদি নিশ্চয়তা থাকত যে আমার একটা চাওয়া পূরণ হবে,' তীরের দিকে এগোচ্ছি, তখন বলল ব্লোম, 'ক্যারিবীয়ানের কোথাও আমি একটা বয়া রাখতাম। তারপর সেই বয়ার চারপাশের এক মাইল সাগর শুকিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতাম নিউ ইয়র্কের চেয ন্যাশনাল সিটি ব্যাংকে।'

এসব চিন্তা মাথায় নিয়ে বন্দরে ঢুকলাম আমরা। একটু পর বুঝলাম, এখনও বিধ্বস্ত নৌযানের কথা শেষ করেনি ব্লোম।

এক বছর আগে, আমাকে বলেছে ব্লোম, ও যখন ডোমিনিকান রিপাবলিকের সিউদাদ ট্রুযিয়োতে ছিল, এক ডুবুরি বন্দরের ক্যাফেতে খবরটা দেয়। রহস্যজনক কোন কারণে তীর থেকে মাইল খানেক দূরে সাগরের খানিকটা জায়গা ফুলে ওপরে উঠে

* কীল, যে কাঠামোর ওপরে তৈরি করা হয় জাহাজ বা নৌকো।

এসেছে। ওখানে ডুবেছিল একটা সোনার মোহর ভরা স্প্যানিশ গ্যালিয়ন। আগেও ওটাকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে, কোন কাজ হয়নি। কিন্তু এখন জাহাজটা হাতের নাগালে চলে এসেছে।

সেদিনই বিকেলে তাড়াহুড়ো করে দুটো নৌকো ভাড়া নিয়ে গ্যালিয়নের ওপরে নোঙর করল ডুবুরি-দল। দুই নৌকোর ক্যাপ্টেনের মধ্যে তর্ক লেগে গেল গ্যালিয়নের অধিকার নিয়ে। নির্ধারণ করা গেল না আগে কে ডুবুরি নামাবে। ফলাফল নির্ধারণে তাদের হাতে বেরিয়ে এলো রিভলভার। ছোঁড়া হলো গুলি। দুটোর একটা নৌকোয় ছিল হেভি মেশিন-গান। ওটাকেও এবার কাজে লাগানো হলো। পরিণতি: সাতজনের মৃত্যু। পরে তদন্তে জানা গেল, সেই আগের মতোই গভীর সাগরে রয়ে গেছে গ্যালিয়ন।

এধরনের দুর্ঘটনা বিরল নয়। একবার আমি কিউবান কাগজে একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম; লেখক ওতে লিখেছেন, গত কয়েক বছরে অনেকগুলো উদ্ধারকারী নৌযান ডুবে গেছে বিপক্ষের উদ্ধারকারীদের আক্রমণে।

উনিশশো পঞ্চাশ সালের দিকে কার্লো রিনোচ্চি নামের এক ইতালিয়ান অভিবাসীর মৃত্যু তদন্ত করে কিউবার পুলিশ। নিজের বাড়ির সেলারে পড়ে ছিল রিনোচ্চির লাশ। মৃত্যুর আগে ভয়াবহ অত্যাচার করা হয় তাকে। পরে, গ্রেফতারকৃত দুই খুনীর জবানবন্দী থেকে গোটা কাহিনী জানতে পারে পুলিশ।

কিউবার কাছে *আইসলা ডি পিনোসে ঘুরতে গিয়ে একটা বিধ্বস্ত নৌযান আবিষ্কার করে রিনোচ্চি। সঙ্গে সঙ্গে ইতালিয়ান এক স্যালভেজ কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু ভুল করে ফেলেছিল; চিঠি পাঠানোর পর কি খুঁজে পেয়েছে সে সম্বন্ধে মুখ খোলা তার কোনমতেই উচিত হয়নি।

এরও কয়েক বছর আগে, আমরা জানি, মেডিটারেনিয়ানে ব্লোম নিজেও ডুবন্ত ধনরত্নের খোঁজে ডুব দিত। প্রথমে নিজেই

* রবার্ট লুই স্টিভেনসনের ট্রেজার আইল্যান্ড।

একা কাজ করত সে, পরে এক বড় কোম্পানির হয়ে। সেই কোম্পানি একবার গোয়েন্দা পাঠাল; পালারমোর কাছে ডুবে যাওয়া একটা জাহাজ আবিষ্কার করেছে এক সিসিলিয়ান জেলে, সেটা উদ্ধারের সম্ভাবনা যাচাই করতে। জাহাজটা ঘিরে আছে দুঃখময় করুণ ঘটনা।

সিসিলিয়ান সেই জেলের নাম ছিল সিজার বোনাটেম্পো। বয়স সত্তর। এক সকালে, নৌকোয় সে মাছ তুলে আনছে, অনুভব করল জালটা অত্যন্ত ভারী ভারী ঠেকছে। জাল তুলে দেখল মাছ ছাড়া আর কিছুই ওঠেনি। হরেক জাতের অসংখ্য মাছ। অস্বাভাবিক। পরের দু'দিনও একই ঘটনা ঘটল। বোনাটেম্পো নিশ্চিত হয়ে গেল যে আপাত অস্বাভাবিক এই প্রাপ্তির পেছনে অতি সাধারণ কোন ব্যাখ্যা না থেকেই পারে না। আর সব জেলেদের মতোই সে জানত যে ডুবন্ত জলযানের কাছেই মাছের ঘনত্ব বেশি হয়। স্পাই-গ্লাস ব্যবহার করল সে, সাগরের যেখানে মাছের ঘনত্ব বেশি সেই পুরো জায়গা খুঁজে দেখল। স্পাই-গ্লাস হচ্ছে একটা সরু টিউব; শেষ প্রান্তে বসানো আছে কাঁচ। সিসিলিয়ানরা স্পাই-গ্লাস ব্যবহার করে টানির ঝাঁক আসছে কিনা দেখার জন্যে। এই টানি প্রতি বছর জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে মেডিটারেনিয়ানে ঢোকে।

সাগরতলের পাথুরে মেঝেতে একটা জলযান দেখল বোনাটেম্পো। দুর্ঘটনার চাকা গড়াতে শুরু করল। বোনাটেম্পোর ইচ্ছে হলো নিজের আবিষ্কারের কথা মানুষকে জানায়। জাহাজটাতে কি ধনরত্ন আছে? হয়তো নেই। ও যদি মুখ খোলে সব কয়জন জেলে জেনে যাবে জাহাজটার অবস্থান। মুখ বন্ধই রাখল বোনাটেম্পো, কিন্তু প্রতিদিন এত মাছ নিয়ে ফিরতে লাগল যে মানুষ কৌতূহলী হয়ে উঠল।

একদিন সে মাত্র সাগরে বেরবে, এমন সময়ে দু'জন লোক এসে রিভলভার ঠেকিয়ে তাকে জোর করে সৈকতের পাথরের আড়ালে নিয়ে গেল। বেধড়ক মার মারা হলো তাকে, কিন্তু মুখ

খুলল না বোনাটেম্পো। এক সময় পড়ে গেল সে। মাথাটা ঠুকে গেল একটা পাথরে।

কিছুক্ষণ পর ওই পাথরের পাশেই তাকে দেখতে পেল একদল বাচ্চা ছেলে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো বোনাটেম্পোকে। হাসপাতালেই কয়েক দিন পর মারা গেল সে। ডুবন্ত জাহাজটা তল্লাশী করে দেখা হলো; কিছুই ছিল না ওটাতে।

'আমি যখন কিউবাতে এলাম,' বলল ব্লোম, 'ভেবেছিলাম মেডিটারেনিয়ানে যা করেছি, কিউবাতেও তাই করব। কিন্তু স্যালভেজের কাজ করতে গেলে অনেক টাকা মূলধন লাগে। আজকাল বড় কোম্পানিগুলোই শুধু লাভজনক ভাবে স্যালভেজের কাজ করে। একা কোন ডুবুরি যা পায়, সেটা না পাওয়ারই সমান। আমেরিকা থেকে সোনা আর মণি-মাণিক্য নিয়ে স্পেনে ফেরার পথে ডুবে গিয়েছিল বিখ্যাত প্ল্যাট ফ্লীট। ওটার খোঁজে ডুবুরিদের রাজা হ্যারি রাইজেনবার্গ বাহামায় ডুব দিয়েছিলেন, কয়েক মিলিয়ন ডলারের সম্পদ উদ্ধারও করেছিলেন, অথচ খরচাপাতি যা করেছেন সেটা মেটানোর পর তাঁর নিজের প্রায় কিছুই ছিল না।'

পাঁচ

হাভানা বন্দরে ঢোকার মুখে, এক পাশে রয়েছে প্রাচীন এক দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। ফোর্ট মরো। একসময় কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো দুর্গটা। ওটা সম্বন্ধে প্রচলিত আছে নানা কাহিনী। আজকে আমি যেটা বলব সবগুলোর মধ্যে সেটা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক।

অনেক কাল আগে, ইচ্ছে হলে প্রধান কারারক্ষী মাঝেমধ্যে এক আধজন বন্দিকে পালানোর সুযোগ দিত। শর্ত একটাই, তাকে পালাতে হবে দুর্গ থেকে সাগরে নেমে যাওয়া একটা ঢালু পাইপের ভেতর দিয়ে। একজন লোক পিছলে নামতে পারবে, পাইপটা ছিল ততটা চওড়া। বলা বাহুল্য, সাগরের যে অংশে পাইপ শেষ হয়েছে, সেখানটা ছিল হাঙরের বিচরণক্ষেত্র।

কতজন বন্দি ওপথে পালাতে রাজি হয়েছে? কিউবার ইতিহাস সে-খোঁজ রাখেনি, কিন্তু বলা হয় অন্তত একজন বন্দি পালাতে পেরেছিল। নিরাপদেই উপকূলে পৌঁছায় সে। রওয়ানা হওয়ার আগে কারাপ্রধানের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল এক দোয়াত কালো কালি; কালি মেখে তারপর পাইপে করে সাগরে নেমে যায় লোকটা। পরবর্তীতে ছোট একটা ব্যবসা কেনে সে, শোনা যায় দীর্ঘদিন বেঁচেবর্তে মহা আনন্দে জীবন কাটিয়ে গেছে।

গল্পটা আমাকে বলেছেন সেনোর আলফান্সো মেয়ো। আমি আর ব্লোম মাছ ধরে ফেরার পর বন্দরে সবসময় ভ্যানে বসে অপেক্ষা করেন তিনি; মাছ নিয়ে ফ্যাক্টরিতে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। এক সকালে তাঁর সঙ্গে দুর্গের পাদদেশে হাঁটছি আমি, হঠাৎ মুখ তুলে দুর্গের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ব্যক্তিগত মতামত যদি জানতে চান, আমি ওই কাহিনী বিশ্বাস করি না।'

আমি বললাম, দুটো কারণে বন্দি মুক্তি পেয়ে গিয়েছিল এমন হতে পারে। এক, কালো রঙ মেখেছিল সে। কালো রঙের কোন কিছুকে হাঙর কখনও আক্রমণ করে না। দুই, হাঙরের দল সেদিন হয়তো অন্য কোথাও ছিল।

'হাঙরের কথা আমি ভাবছি না,' বললেন আলফান্সো। 'আমার কাছে অবিশ্বাস্য লেগেছে কিউবান কারারক্ষীর নৃসংশতা।'

চল্লিশ বছরের হাঙরের ব্যবসা সেনোর মেয়োকে শুধু যে রসিক করে তুলেছে তাই নয়, তিনি বিশাল এই মাছগুলো সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন। তিনি আমার চেয়ে ভাল জানেন যে

কালো রঙ হাঙরের আক্রমণ থেকে বাঁচার পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয়। (পূর্ণ নিশ্চয়তা পাওয়া যায় শুধু পালিয়ে বাঁচতে পারলে।) কিউবান সমুদ্রের অনেক জায়গায়, যেখানে গিজগিজ করছে ক্ষুধার্ত হাঙর, নিগ্রোরা নিশ্চিন্তে পানিতে ডুব দেয়, হাতে পায়ের তালুতে আলকাতরা মেখে।

'নিগ্রোরা আক্রান্ত হয়েছে শুনেছি আমি, তবে আমার ধারণা সেগুলো বর্ণবাদী (Colonialist) হাঙর।'

দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পেরিয়ে এলাম আমরা। সমুদ্রের তীরে নিচু একটা দেয়ালে বসলেন আলফাঁসো, পকেট থেকে বের করলেন পাইপ। এতক্ষণ মাছিরা দল বেঁধে আমাদের চারপাশে ভনভন করছিল; পাইপের ধোঁয়ায় মুহূর্তে গায়েব হয়ে গেল ওরা। আলফান্সোর তামাকের রঙ কালো, ধোঁয়া এতই কটুগন্ধী যে দম আটকে মারা পড়ত সব কয়টা। বিপদ বুঝে ভেগেছে। ঘন ধোঁয়ার এই নিরাপদ চাদরে আচ্ছাদিত হয়ে, কখনও কখনও তামাকের কষভরা থুতু সাগরে ফেলে, হাঙরের স্বভাব সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করলেন মোটাসোটা আলফান্সো।

আমি জানলাম গত এই একমাসে আমি শুধু ব্লু শার্ক আর টাইগার শার্ক ধরেছি। (শুধু কোজিমারেই আমি একবার একটা হ্যামারহেড শার্ক দেখেছিলাম ধরা পড়তে। ওটা ছিল ফুট দশেক লম্বা। সাধারণ হাঙরের সঙ্গে দুটো বিষয়ে অমিল আছে হ্যামারহেডের। এক, মাথাটা একেবারে হাতুড়ির মতো। দুই, চোখগুলো হাঙরের মতো না হয়ে ষাঁড়ের চোখের মতো বড় হয়।) টাইগার শার্কের মতোই ব্লু শার্কও মানুষখেকো। নিজেদের মাংসও খায় ওগুলো, বলেছেন মেয়ো।

বিশেষ করে কোজিমারে সব জেলেই জানে যে হাঙর হুকে আটকালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটাকে নৌকোয় তুলে আনা জরুরী। দেরি করে ফেললে স্বজাতির আক্রমণে বারোটা বেজে যায় আটকা পড়া হাঙরের। বাজারে তখন কোন দামই পাওয়া যায়

না। নৌকোয় সব সময় পুরোনো খবরের কাগজ রাখে জেলেরা। অন্য হাঙরদের আগমন দেখলেই কাগজগুলো এদিক ওদিক ছুঁড়ে দিয়ে হাঙরদের ভাঁওতা দেয়, যাতে হুকে আটকা পড়া হাঙর নিরাপদে নৌকোয় তুলে আনা যায়। কালো যেমন হাঙরদের অপছন্দ, ঠিক তেমনি পছন্দ করে ওরা সাদা। সাদা দেখলেই পিছু নেয়ার একটা ঝোঁক আছে হাঙরের।

ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে গেলে, এবং তাড়াতাড়ি মাছকে তুলতে না পারলে সবসময় অন্য মাছের আক্রমণ থেকে আটকা পড়া মাছটিকে বাঁচানো যায় না। প্রায়ই ব্লোম আর আমি সোর্ডফিশ বা হাঙর ছিপ দিয়ে ধরতে গিয়ে ধোঁকা খেয়েছি। জোরে হঠাৎ সুতোয় টান পড়ে, যেন প্রচণ্ড শক্তিতে সুতো টানছে কোন একটা কিছু, তারপর ঢিলে হয়ে যায় সুতো, সুতো গুটিয়ে দেখা যায় মাত্র অর্ধেকটা সোর্ডফিশ বা হাঙরের মাথাটা শুধু আছে লাইনের শেষে। বাকিটা কামড়ে নিয়ে গেছে ওদেরই স্বজাতি।

'এই কারণেই আমি মনে করি না হেমিংওয়ের দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী'র অভিযান কাহিনী খুব একটা বাস্তব সম্মত,' বললেন আলফান্সো মেয়ো। 'এইরকম সাগরে, যেখানে হাঙরের অভাব নেই, সেখানে কোন লোক একটা মার্লিনকে লাইনের শেষ মাথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাধিয়ে রাখার পর নৌকোয় আস্ত তুলে আনতে পারবে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

যে দেয়ালের ওপরে আমরা বসে আছি, তার পাদদেশে এসে মাথা খুঁড়ছে সাগরের ঢেউ, সাদা ফেনা তুলছে বাড়ি খেয়ে। ঢেউয়ে নাচছে সামুদ্রিক আগাছা আর মানুষের ফেলা জঞ্জাল। হাঙর ব্যবসায়ী বেশ কিছুক্ষণ সেই ময়লা দেখলেন মনোযোগ দিয়ে, তারপর বললেন, 'হাঙরের অনেকগুলো বিস্ময়কর ক্ষমতার মধ্যে একটা হচ্ছে এদের গন্ধ পাবার ক্ষমতা। নাবিকরা বলে জাহাজে কোন লাশ থাকলে সেই জাহাজের পেছনে হাঙরের দল লেগে যায়। এটা অবশ্য কিংবদন্তিও হতে পারে...তবু বলছি, শুনুন

একটা কাহিনী। এক ফ্রেইটারের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। লোকটা অদ্ভুত একটা কাজে নিয়োজিত। আমেরিকায় মারা যাওয়া চাইনিজদের লাশ আত্মীয়রা চায় চীন দেশে কবর দিতে। লাভজনক ব্যবসা, স্যান ফ্র্যান্সিসকো থেকে জাহাজে করে লাশ নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের কাছে বুঝিয়ে দেয়া তার কাজ। ছোট একটা নেভিগেশন-কোম্পানি এধরনের কাজে নিয়োজিত ছিল। আর যে ক্যাপ্টেনের কথা বলছি সে ছিল লাশ বওয়া ফ্রেইটারের ক্যাপ্টেন। সে বলেছে জাহাজ যখনই খোলা সাগরে যেত, অমনি একদল হাঙর জাহাজের পিছু নিত। জাহাজ একেবারে বন্দরে ঢোকার আগে পর্যন্ত পিছু ছাড়ত না ওগুলো। জাহাজটা যে সবসময়েই লাশ বহন করত তা নয়, অন্য জাহাজকেও হাঙর অনুসরণ করে এটাও সে লক্ষ করে দেখেছে, তবে অত উৎসাহের সঙ্গে এক নাগাড়ে নয়। আশ্চর্যের কথা হলো লাশগুলো থাকত সীসের কফিনে। গন্ধ বের হবার কোন উপায় ছিল না। হাঙর কি মৃত্যুর গন্ধ পায়?'

হারবারের কাছেই ছোট একটা বাড়িতে থাকেন সেনোর মেয়ো। সে-বাড়িতে যেতে যেতে আমি জানলাম বারো-তেরো রকমের হাঙর আছে। এসব হাঙর পৃথিবীর প্রায় যেকোন সাগরেই, এমনকি মেডিটারেনিয়ানেও দেখতে পাওয়া যায়। ছোট এগুলো। ধরে নেয়া হয় নিরীহ। তবে একথা যখন লিখছি খবরের কাগজের একটা রিপোর্ট আমার সামনে আছে। 'সেইন্ট-লরেন্ট-ডু-ভারে অজানা মাছ গোসলকারীর পা কেটে নিয়ে গেছে। মাছটা ছিল সম্ভবত হাঙর।'

সেইন্ট-লরেন্ট-ডু-ভারে ধরা পড়া মাছগুলো হয়তো আসলে ব্যারাকুডা। তাছাড়া সী-পাইকও হাঙরের মতোই সর্বভুক। বিশেষ করে ক্যারিবীয়ানে ওগুলো এতই বড় হয় যে টাইগার শার্কের চেয়েও ওগুলোকে বেশি ভয়ানক বলে গণ্য করা হয়।

'হাঙর ভীতু হয়,' বললেন আলফান্সো। 'হাঙর যখন পানির ওপর খাবার ছিঁড়ে খায় তখন আপনি যদি হাত নাড়েন আর

চেঁচান, তাহলে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় ওরা। তবে ব্যারাকুডা কখনোই ভয় পায় না।

'স্লীপার-শার্ক নামের এক জাতের হাঙর আছে গ্রীনল্যান্ডে। বরফে গোল গর্ত খুঁড়ে ওগুলোকে ধরে এস্কিমোরা। গর্তের কাছে আগুন জ্বালে। সেই আলোয় আকৃষ্ট হয়ে কাছে আসে হাঙর। আর কাছে এলেই হারপুন দিয়ে গেঁথে ফেলে এস্কিমোরা। আরেকটা উপায় হচ্ছে টোপ হিসেবে গর্তে রক্ত ভরা একটা ব্লাডার নামিয়ে দেয়া, সেই ব্লাডারের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে বের হয়। গন্ধে ছুটে আসে হাঙর। টোপ গিলে ফেলে। তখন দড়ি টেনে হাঙরটাকে বরফের ওপরে তুলে আনা হয়। গ্রীষ্মে কাইয়্যাকে (ডিঙি নৌকো) চড়ে মাছ ধরে এস্কিমোরা। কাইয়্যাক এতই সরু আর ছোট হয় যে প্রায়ই ডুবে যায় ওগুলো। তবে সেজন্যে ততটা ভীত হয় না এস্কিমোরা, ওদের ভয়ের কারণ হাঙর। হাঙর যদি কাইয়্যাকের গায়ে ডলা দেয় তো ফুটো হয়ে যাবে ওদের নৌকো। বিশেষ ওই প্রজাতির হাঙরের গা এবড়োখেবড়ো, খসখসে। কাঁটা থাকে গায়ে।

'এমনও শিকারী আমি দেখেছি যারা পুরো মাছটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে,' বলল মেয়ো। 'এটাকে আমার অপচয় মনে হয়। আমার মতামত হলো, হাঙর ধরার সেরা উপায় হচ্ছে রক্ত-ভরা ব্লাডার, এস্কিমোরা যেমনটা ব্যবহার করে। পরপয়েজের ব্লাডার। পরপয়েজ গরম রক্তের প্রাণী। ওটার রক্তের গন্ধে পাগল হয়ে ওঠে হাঙর।

'কিন্তু পরপয়েজকে কে খুন করবে? পারবে? পারবে না।' দুঃখিত চোখে তাকালেন আলফান্সো। মাথা নাড়লেন। 'পরপয়েজ মারার অর্থ হচ্ছে অনেকটা ঘাসের মাঠের মধ্যে গরু জবাই করা। পরপয়েজ হচ্ছে সাগরের রসিক প্রাণী, সেনোর। নানা রকম খেলা দেখিয়ে নাবিক আর অভিযাত্রীদের আনন্দ দেয় ওরা। আমার তো ধারণা ওরা সাধারণ প্রাণী নয়, আমাদের পূর্ব পুরুষ। পুনর্জন্ম

হয়েছে, আমাদের সময়টা যাতে চমৎকার কাটে।'

আলফান্সো মেয়োর বাড়ির বড় ঘরটা, যেটা ড্রইংরুমের কাজ করে, সেটাতে ঝোলানো আছে অসংখ্য জাল আর ভার্জিন মেরির ছবি। ছবিগুলোর প্রত্যেকটার তলায় জ্বালানো আছে একটা করে ছোট পিদিম। ফিতেগুলো ডুবে আছে পিদিমে রাখা তেলের ভেতরে। একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার্সের ওপরে রাখা আছে স্টাফ করা হাঙর। আমাকে দেখানোর জন্যে ড্রয়ার থেকে হাঙরের ফসিল করা দাঁত বের করলেন হাঙর-ব্যবসায়ী। দাঁতটা মানুষের হাতের সমান চওড়া। আলফান্সো আমাকে জানালেন, দাঁতটা প্রায় একশো মিলিয়ন বছর আগের।

'প্রাগৈতিহাসিক হাঙরের শুধু দাঁতই আজও পাই আমরা,' বললেন আলফান্সো। 'বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন যে-চোয়াল থেকে এই দাঁত খুলে নেয়া হয়েছে সেই রকম বড় চোয়াল থাকলে ছয় ফিটের কোন মাছকেও খেয়ে ফেলত হাঙর। আর দেহ? ওই সব হাঙরের দেহ ছিল একশো তিরিশ ফিট থেকে একশো ষাট ফিট। আজকের দুনিয়ায় সব চেয়ে বড় হাঙর যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে পিলগ্রিম শার্ক আর হোয়েল শার্ক। ওগুলো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফিট লম্বা হয়। নিরীহ ওরা, ছোট ছোট দাঁত; বাস করে পানির অনেক গভীরে। ওগুলোর চামড়ার কোন ব্যবসায়ীক মূল্য নেই, চামড়ার পুরুত্ব প্রায় চার ইঞ্চি।'

খুব কমই ধরা পড়ে *এসব হাঙর। মেয়ো আমাকে বলল চল্লিশ বছরে মাত্র চার-পাঁচটা হোয়েল শার্ক ধরা পড়তে দেখেছে সে। শেষবার দেখেছে কয়েক বছর আগে, সান্তিয়াগো দ্য কিউবার কাছে। সেসময়ে সাগরের নির্দিষ্ট একটা জায়গায় নিয়মিত শহরের বর্জ্য ফেলা হতো। ওখানে সবসময়ে চার-পাঁচটা হাঙর কাছ থেকে দেখা যেত, ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাঙরের আস্তানা ছিল জায়গাটা।

*ব্রিটন উপকূলে নিয়মিত পিলগ্রিম শার্ক ধরা হয়। ওগুলোর মাংস হাঁস-মুরগির খাবার।

একদিন ওখানে ছেচল্লিশ ফিট লম্বা একটা হাঙরকে হারপুনে গাঁথা হলো। সান্তিয়াগোর রাস্তায় ওটাকে প্রদর্শনীর জন্যে কয়েক ঘণ্টা রাখা হয়েছিল। শহরের সবাই ওটাকে মনের আশ মিটিয়ে দেখেছে, কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারেনি অনেকে। চোয়ালটা বড় ছিল সত্যি, কিন্তু দাঁতগুলো ছিল বাচ্চার দাঁতের মতোই ছোট।

ছয়

আমি আর ব্লোম যখন কোন হাঙর নিয়ে ফিরি, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মাছটাকে বিচার করে দেখেন মেয়ো। হিসেব করে বের করেন চামড়ার মূল্য, লিভারের দাম, মাংসের দর আর ফিন বেচে কত পাবেন। এতই পাকা হিসেব যে সাধারণত এক ডলারও দামে এদিক ওদিক হয় না। কখনও কখনও লোভে পড়ে হাঙরকে ছুঁয়ে দেখেন। যদিও মনে করেন তাতে ওঁর হাতের মর্যাদা হ্রাস পেয়ে থাকে।(কব্রিটন উপকূলে নিয়মিত পিলগ্রিম শার্ক ধরা হয়। ওগুলোর মাংস হাঁস-মুরগির খাবার।)

মেয়োকে সার্ডিনের মতো আপাদমস্তক মুড়ে হাঙরগুলোকে ভ্যানে তোলার সময় দেখি আমরা। আমার মনে পড়ে যায় আগেরকালের নাবিকরা এই মাছের নাম দিয়েছিল রেকুইন্‌স্‌, কারণ ওদের উপস্থিতি তাদের মনে করিয়ে দিত মৃতের জন্যে প্রার্থনার কথা।

প্রতি সকালে ভ্যানে করে আমাদের ধরা মাছ নিয়ে ফ্যাক্টরিতে যান মেয়ো। কোজিমারের লোকদের যেহেতু নিজেদের ফ্যাক্টরি

আছে, তাই যারা একা মাছ ধরে তাদের সঙ্গেই মেয়োর যোগাযোগ। অর্থাৎ তীরের পাশ দিয়ে হাভানা ছাড়িয়ে প্রতিদিন বিশ-তিরিশ মাইল গাড়ি চালান মেয়ো। মাঝেমাঝে জেলেদের জন্যে রসদ নিয়ে যান। জেলেদের নিয়েও আসেন কখনও কখনও। এভাবেই স্যান্ড্রিয়োর সঙ্গে পরিচয় হলো আমাদের।

হাভানা থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে, কোজিমারের কাছাকাছি মাছ ধরে স্যান্ড্রিয়ো। দিনে মাছ ধরে ও। ও বলেছে পদ্ধতিটা ওর একান্ত নিজস্ব। ওর নৌকোয় আছে ফাঁসিকাঠ আকৃতির একটা মাস্তুল। সেই মাস্তুল থেকে দড়ি বেঁধে পানির কয়েক ইঞ্চি গভীরে পচা মাংস নামিয়ে দেয় ও।

হাঙর যখন মাংসের লোভে কাছে আসে, হারপুন দিয়ে মাছ শিকার করে স্যান্ড্রিয়ো। হাঙর নৌকোয় তোলার সময় মাংস উঠিয়ে নেয়, যাতে আর কোন মাছ খেয়ে যেতে না পারে। তারপর হাঙর তোলার ব্যস্ততা কমলে আবার নামিয়ে দেয় মাংস। অপেক্ষায় থাকে। এভাবে বেলা এগারোটার আগেই প্রতিদিন ছয়-সাতটা করে হাঙর ধরে ফেলে ও।

একটু কুঁজো স্যান্ড্রিয়ো। দড়ির মতো পাকানো শরীরের ছোটখাটো এই লোকটির আছে অপূর্ব সুন্দর মায়াময় কালো দুটো চোখ। ডান হাতের বদলে কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা লোহার হুক। কয়েক বছর আগের এক অভিযানের ফল। ছোট একটা হাঙর নৌকোয় তুলেছিল ও। ভেবেছিল মরে গেছে মাছটা। কিন্তু আসলে মরেনি। হাঙরটা কামড়ে দেয় ওর ডান হাতে। ক্ষতটা বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। হাভানার হাসপাতালে গিয়ে হাতটা কেটে বাদ দিতে হয় স্যান্ড্রিয়োকে।

মেয়ো যেদিন ওকে নিয়ে এলেন, সেদিন শহরে রসদ কিনতে এসেছিল সে। ব্লোমকে ও চেনে, এক সঙ্গে মাছও ধরেছে। আমাদের ও দু'একদিন ওর বাড়িতে থেকে যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানাল।

তীরের কাছে জনশূন্য এলাকায় নির্জন একটা কাঠের কুটিরে ভাতিজা টিনো আর এক সহকর্মীর সঙ্গে বাস করে স্যান্ড্রিয়ো। সহকর্মীর বয়স বড়জোর বারো। স্যান্ড্রিয়ো যখন হাঙরকে হারপুনে বিদ্ধ করে, টিনো তখন পচা মাংসের টুকরোটা পানি থেকে তুলে নিয়ে আসে। রাতে যখন স্যান্ড্রিয়ো সোর্ডফিশ বা টিউনা শিকারে বের হয়, তখনও হুকে ও-ই টোপ গেঁথে দেয়।

মটোরকোচ দুর্ঘটনায় বাবা-মাকে হারিয়েছে টিনো কয়েক বছর আগে। তারপর থেকেই চাচার সঙ্গে আছে। ওর চাচার ইচ্ছে দক্ষ একজন জেলে হবে একদিন ও। স্যান্ড্রিয়ো আশা করছে, আর তিন-চার বছর পর নিজেই হাঙর শিকারের উপযুক্ত হয়ে উঠবে টিনো।

কোজিমারের জেলেরা মাছ তুলে আনার যে পদ্ধতি ব্যবহার করে সে তুলনায় স্যান্ড্রিয়োর পদ্ধতিতে মাছ নৌকোয় তোলা অনেক কষ্টকর। তবে হারপুন ছোঁড়ায় স্যান্ড্রিয়ো অত্যন্ত সুদক্ষ। বিশ ফিট দূর থেকে তাসের মাঝখানে হারপুন বিঁধিয়ে দিতে পারে ও। তাই বলে সব সময়ে যে মাছের গায়ে ঠিক মতো বেঁধাতে পারে তা নয়। যখন পারে না তখন দুর্দান্ত লড়াই হয় দুই পক্ষের মধ্যে। প্রায়ই ওর নৌকো কয়েকশো গজ টেনে নিয়ে যায় মাছ। এমনও হয় যে খোলা সাগরে চলে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে হারপুনে বাঁধা দড়ি কেটে দিতে হয় স্যান্ড্রিয়োকে।

ওর বাড়িতে এসে প্রথম কাজ ব্লোম যেটা করল সেটা হচ্ছে হারপুনগুলো পরীক্ষা করে দেখা। কাঠের শ্যাফ্‌টে আটকানো লোহার বল্লম ওগুলো। সামনের অংশটা তীরের মাথার মতো, ধারের দিক থেকে ক্ষুরের চেয়ে কম যায় না।

ব্লোম যখন হারপুন ওজন করে দেখছে, আমি তখন স্যান্ড্রিয়োর কুঁড়ের সামনের সাদা বালুময় সৈকতের দিকে তাকালাম। আজকের দিনটা সোনালী কোমল রোদে ঝলমল

করছে। এমন দিন ক্যারিবীয়ানে খুব কমই দেখা যায়। এই পরিবেশ আমাকে কোতে দ্য অ্যাযারের কথা মনে পড়িয়ে দিল। মনে হলো সৈকতে গিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকি, বিশ্রাম নিই। তবে তার কোন উপায় নেই। ইতিমধ্যেই সাগর-যাত্রার জন্যে নৌকো তৈরি করে ফেলেছে স্যান্ড্রিয়ো। আধ ডজন হারপুন তুলেছে ও নৌকোয়। সঙ্গে একটা মৃত ঘোড়ার অর্ধাংশ।

এক ঘণ্টা পর তীর থেকে তিন-চার মাইল সরে এলাম আমরা। দুটো ডোরাও ধরল টিনো। ওগুলো দিয়েই দুপুরের খাওয়ার পালা চুকাব আমরা। এই সবজেটে মাছগুলো, যেগুলোর আসল নাম আমি জানি না এবং জানবও না কখনও, সেগুলো অসম্ভব রকমের পেটুক। টিনো টোপ ফেলতে না ফেলতে দু'পাশ থেকে দুটো ডোরাও ছুটে এসে গিলে ফেলল টোপ। ভাব দেখে মনে হলো খায়নি অন্তত দুই সপ্তাহ।

তিরিশ সেকেন্ড পুরো হবার আগেই নৌকোয় তুলে ফেলা হলো ওগুলোকে। দুটোর একটা পুরো তিন ফিট লম্বা। ওটার মাথার কাছে বড় একটা ক্ষত, শুকিয়ে এসেছে প্রায়। বোধহয় ব্যারাকুডা বা হাঙর আক্রমণ করেছিল।

যখন আমরা তীর থেকে ছয় মাইল দূরে, বোটের এঞ্জিন থামিয়ে দিল স্যান্ড্রিয়ো। মাস্তুল থেকে ঘোড়ার মাংসের বড় টুকরোটা নামিয়ে দিল পানিতে। সাগর-তলের রাজকীয় গুহায় বেজে উঠল হাঙর-দেবতার ঘণ্টি। জেলেরা বলে, যখনই কোন হাঙরের মৃত্যুর সময় হয়, ঘণ্টি বাজায় হাঙর-দেবতা।

শুরু হলো অপেক্ষার পালা। অপেক্ষা থেকে রেহাই নেই। ব্লোম আমাকে হোটেলের বিছানা থেকে টেনে তুলে নিয়ে এসেছে। ভাবটা এমন ছিল যে হোটেলে আগুন লেগেছে। ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে কোজিমারের সরু রাস্তা ধরে ওর ফোর্ড ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে ও আমাকে স্যান্ড্রিয়োর কাছে। এখন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা আমরা করতে লাগলাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

ফোঁটা ফোঁট রক্ত পড়ছে দুর্গন্ধযুক্ত ঘোড়ার মাংস থেকে, মিশে যাচ্ছে সাগরের পরিষ্কার নীল পানিতে। সাগরে কোন ঢেউ নেই। আকাশে এমনকি একটুকরো মেঘের ছিঁটেফোঁটাও নেই। আমাদের পেছনে ঝাপসা সবুজ দেখাচ্ছে উপকূল। কলাগাছের ছড়াছড়ি ওখানে।

শেষ পর্যন্ত, প্রায় দুপুরের দিকে, তিন-চারবার আমাদের নৌকোর অবস্থান বদলানোর পর প্রথম হাঙরটার দেখা পাওয়া গেল। এর আগে কখনও এভাবে মুক্ত হাঙর দেখার সুযোগ আমার হয়নি। এই হাঙরটা আমাদের নৌকোর এত কাছে এলো যে ইচ্ছে হলে ঝুঁকে ওটাকে আমি ছুঁয়ে দিতে পারতাম। অবশ্য হাতটা হারাতে হতো আমাকে!

দৃশ্যটা অভূতপূর্ব। সাবলীল তীব্র গতির এক অপূর্ব উদাহরণ। টোপের দিকে ছুটে এলো জন্তুটা, তারপর লেজের সামান্য এক ঝাপটায় মুহূর্তে ঘুরে গেল উল্টোদিকে। দূরে চলে গিয়ে ফিরে এলো আবার। দেখে মনে হলো দ্বিধায় ভুগছে। টোপ না ছুঁয়ে গন্ধ শুঁকছে।

প্রায় এক মিনিট এভাবেই কাটল। তারপর সাগরের গভীরে তলিয়ে গেল হাঙরটা। ওটা ছিল নীল হাঙর। প্রায় বারো ফিট লম্বা। দু'পাশে চমৎকার দুটো দাগ। দেখে মনে হয়েছে শরীরটা ধাতুর তৈরি। অদ্ভুত এক ভয়াবহ খেলনা, চলছে অদৃশ্য এঞ্জিনের সাহায্যে। আমার দিকে তাকাল স্যান্ড্রিয়ো। হাসল। বলল, 'আবার আসবে ও। এবার সঙ্গে করে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আসবে। এক সঙ্গে দুপুরের খাবার খাবে ওরা।'

স্বাভাবিক ভাবে এটাই হয়। একটা হাঙর এসে টোপ না ছুঁয়েই চলে যায়। একটু পরে ফিরে আসে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে। মাছের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ কেউ কি বলতে পারবে, কী রহস্যময় কারণে সাগর-গভীরের হাঙররা একে অন্যকে খাবারের খোঁজ দেয়?

এবার এক যোগে তিনটা হাঙর এলো। একই সঙ্গে তিন দিক

থেকে টোপের দিকে ধেয়ে এলো ওরা। মাত্র কয়েক সেকেন্ডে ওদের তিন-চার ফিটের মধ্যে পানি হয়ে গেল লালচে। পানির ঝাপটায় বাদামের খোলার মতো নাচতে লাগল আমাদের নৌকো। ডান হাতের হুক দিয়ে মাস্তুল ধরল স্যান্ড্রিয়ো, বাম হাতে হারপুন বাগিয়ে তৈরি হয়ে গেল। উপযুক্ত সময়ে আঘাত হানবে।

হারপুনটা কখন ছোঁড়া হলো সেটা আমি দেখলাম না, শুধু দেখলাম বান্ডিল থেকে সরসর করে ছুটে যাচ্ছে হারপুনে বাঁধা দড়ি। দেখলাম আহত হাঙর ডুব দিল। স্যান্ড্রিয়োর মাত্র একটা হাতই কাজে লাগে। এক ফুট করে দড়ি টেনে আনতে লাগল সে। পায়ের তলায় টেনে আনা দড়ি আটকে রেখে আবার টেনে আনল এক ফুট।

কি প্রচণ্ড পরিশ্রম স্যান্ড্রিয়োকে করতে হয় তা পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন। ডান হাতের হুক দিয়ে মাস্তুলের যে জায়গাটা ও আঁকড়ে ধরে আছে সেখানের কাঠে গভীর হয়ে দাগ বসে গেছে। দরদর করে ঘামছে ও। ফোঁসফোঁস করে দম ফেলছে।

মাত্র কয়েক মিনিটেই হাঙরটা চলে এলো নৌকোর পাশে। হাতে কসাইয়ের ছুরি নিয়ে মাছটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল স্যান্ড্রিয়ো। ঘ্যাঁচ করে ঢুকিয়ে দিল হাঙরের পিঠে। এতে করে হাঙরটা অবশ হয়ে যাবে। এবার হাঙরটাকে মারার জন্যে ওটার চোখে বর্শার ফলা ঢোকাল ও।

সেদিন দুপুর দুটোর মধ্যে নৌকোর পাটাতনের নিচে ঠাঁই পেল পাঁচটা হাঙর। হারপুন দিয়ে স্যান্ড্রিয়ো মেরেছে তিনটা, ব্লোম দুটো, আর আমি মিস করেছি একটা!

চারটার সময় আবার শুরু হলো আমাদের শিকার। সন্ধে যখন ঘনিয়ে এলো, সকালে ধরা পাঁচটা হাঙরের সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও তিনটা। সৈকতে স্যান্ড্রিয়ো হাঙরগুলো ছুঁড়ে ফেলার পর দুটো ছোট মাছ ছিটকে পড়ল বালিতে। মাছগুলোর মাথায় একটা

করে গোল চাকতি আছে। চাকতির মাঝখানে একটা উঁচু রেখা। ওটা চোষক। এই মাছ মাংসাশী, থাকে হাঙরের থুতনির তলায়। হাঙর শিকার করলে তাতে ভাগ বসায়। হাঙরের দাঁত থেকে খাবার খুঁটে দাঁত পরিষ্কার করে দেয়। এগুলোর নাম পাইলট ফিশ। অনেকে বলে হাঙরকে পানির তলায় দ্রুত ঘুরতে সাহায্য করে এই মাছ।

'এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতদ্বৈততা আছে,' মন্তব্য করল ব্লোম। 'যারা বলে পাইলট ফিশ শুধুই পরজীবী, আমি তাদের দলে। হাঙরের খাবারে ভাগ বসিয়েই বেঁচে থাকে এরা।'

প্রচণ্ড জোরে টান দিয়ে তারপরই শুধু হাঙরের গা থেকে পাইলট ফিশকে ছাড়ানো যায়। এ যেন কাঁঠালের আঠা। পলিনেশিয়ার অধিবাসীরা কাছিম ধরতে এই মাছকে জীবন্ত বড়শি হিসেবে ব্যবহার করে। ওরা পাইলট মাছের লেজে দড়ি বেঁধে কাছিম আছে এমন জায়গায় ছেড়ে দেয়। পাইলট মাছ যেই কাছিমের গায়ে সেঁটে বসে, অমনি দড়ি টেনে কাছিমটাকে তুলে আনে ওরা।

সেরা হাঙর-শিকারীদের একজন, উইলিয়াম ইয়ং তিরিশ বছরেরও বেশি সময় দুনিয়ার বিভিন্ন সাগরে হাঙর শিকার করে বেড়িয়েছেন। তিনি একটা ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। এক অ্যাকুইরিয়ামে ঘটে সেই ঘটনা। ওই অ্যাকুইরিয়ামে ছিল বেশ কিছু বড় মাছ। মাছের তদারককারী পুলের মাঝে নৌকোয় বসে একটা পাইলট ফিশের লেজে দড়ি বেঁধে নিচে নামিয়ে দিয়েছিল। মাছটা একটা পাঁচ-ছয় ফিট দীর্ঘ হাঙরের গায়ে সেঁটে যায়। তদারককারী দড়ি টেনে তুলে আনে হাঙরটাকে। জোরে টান দিয়ে নৌকোর ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে ওপারে নিয়ে আবার পানিতে ফেলে দেয়।

সেদিন বিকেলে, হারপুন দিয়ে আমাদের মাছ ধরার প্রথম দিনে অনেক দেরি করে রাতের খাবার খেলাম আমরা। স্যান্ড্রিয়োর

বাড়ির সামনে টেরেসে বসলে দেখা যায় সৈকতের পাথরগুলো। ঢেউয়ের মাথায় জ্বলে ওঠা ফসফোরেসেন্টের আলোর ওপারে দেখা যায় রাতের শান্ত সাগরে একের পর এক জ্বলে উঠছে টিমটিমে আলো। নিজেদের কাজে বেরিয়ে পড়েছে কোজিমারের জেলেরা।

টেবিল পরিষ্কার করে তেলের বাতিটা নিভিয়ে দিল টিনো। এতক্ষণ আলোর চারধারে ঘুরে ঘুরে গুঞ্জন তুলে উড়ছিল পোকামাকড়ের ঝাঁক, নতুন আলোর খোঁজে চলে গেল ওগুলো। একটা রকিং চেয়ারে বসে নীরবে ধূমপান করতে লাগল ব্লোম। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে টেরেসের কোনায় বসে আছে স্যান্ড্রিয়ো, তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে।

অদ্ভুত শান্ত আজকের রাতটা। খানিক দূরের পাথরের ফাঁক দিয়ে বালি দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে তুষারের দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি।

আমাদের কাছেই বসে আছে টিনো। ধূমপান করতে করতে স্যান্ড্রিয়োর সঙ্গে আলাপ জুড়লাম আমি। বিশ বছর বয়সে স্পেন থেকে কিউবাতে চলে এসেছিল স্যান্ড্রিয়ো। প্রথম কয়েক বছর আখের প্ল্যানটেশনে কাজ করেছে। সাত-আট বছর কিউবাতে থাকার পর মাছ ধরাকে পেশা হিসেবে নিয়েছে ও। সেসময় হাঙরের ছালের কোন মূল্য প্রায় ছিল না বললেই চলে। ছাল থেকে যে চামড়া তৈরি হতো তা ছিল অত্যন্ত নিম্ন মানের। যে কোম্পানির হয়ে স্যান্ড্রিয়ো হাঙর ধরত, তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল হাঙরের লিভার-অয়েল আর ফিন সংগ্রহ। (ফিন বেচা হতো চাইনিজদের কাছে।) এরপর স্যান্ড্রিয়ো নিজেই মাছ ধরার সিদ্ধান্ত নিল। চলে এলো ও হাভানাতে, উপকূলের এদিকটাতে বসতি করল।

'এখানে তখন পাথর ছাড়া আর কিছুই ছিল না,' বলল স্যান্ড্রিয়ো। 'কিছুই ছিল না পাথর আর বালি ছাড়া, সেনোর। তারপর নিজের হাতে এই বাড়িটা আমি তৈরি করেছি। সে আমার

দুর্ঘটনার আগের কথা।' ডান হাতটা দেখাল সে। 'এখন হলে বাড়ি বানাতে পারতাম না।...তারপর টিনো এলো আমার সঙ্গে বাস করতে।'

কোজিমারে সে কেন থাকেনি সেকথা ভেবে আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম। জবাবে হাত নেড়ে একটা ভঙ্গি করল ও। 'ওখানে থাকলে সমস্যা হতো। এখানে কোন সমস্যা নেই। তা ছাড়া একা থাকা আমি পছন্দ করি।'

কথা বলে চলল ও। বলল ভবিষ্যতে হাভানায় গিয়ে বাস করার ইচ্ছে আছে ওর। তখন ভাল একটা নৌকো কিনবে। বিশ ফিট দীর্ঘ, সঙ্গে থাকবে পাল আর এঞ্জিন। তখন শুধু আনন্দের জন্যেই মাছ ধরবে।

পরবর্তী দিনটাও মাছ ধরে কাটল। সন্ধেতে স্যান্ড্রিয়োর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাভানায় ফিরে চললাম আমরা। গাড়ি যেখানে পার্ক করা ছিল সে পর্যন্ত হেঁটে এলো স্যান্ড্রিয়ো। পেছন ফিরে আমি দেখতে পেলাম, সূর্যের শেষ লালচে আলোয় আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্যান্ড্রিয়ো, ডান হাতের হুক নাড়ছে বিদায় জানানোর ভঙ্গিতে। ওর শেষ কথা যেন এখনও আমার কানে বাজতে লাগল: 'আর পাঁচ বছর পর, সেনোর, আমাকে হাভানার বন্দরে খুঁজতে হবে তোমাকে—চমৎকার একটা নৌকোয় মাছ ধরার সত্যিকারের আনন্দের জন্যে...বুঝতে পেরেছ?'

এক সপ্তাহ পর দুর্ঘটনার খবরটা আমরা জানলাম। 'শার্কে' চড়ে মাছ শিকার করে ফিরেছি তখন। মেয়োর মুখে শুনলাম সকাল থেকে হাভানার হাসপাতালে আছে স্যান্ড্রিয়ো, বাঁচবে সেই সম্ভাবনা কম।

ওকে দেখতে দেয়া হলো না আমাদের। টিনো বলল, অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও সকাল ছয়টায় মাছ ধরতে বেরোয় ওরা। সাধারণত যেসব হাঙর ধরে, প্রায় তেমন বড় একটা হাঙরই

টোপের দিকে ছুটে আসে। কিন্তু টোপের মাংস ছিঁড়ে নিয়ে চলে যাবার বদলে ওটাকে পানির নিচে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল ওটা। আগেও এমন ঘটেছে। টিনো তখন দড়ি ছেড়েছে, তারপর হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে হাঙরের মুখ থেকে ছুটিয়ে এনেছে টোপ।

এবার ও তাড়াহুড়ো করে ফেলেছিল। মাস্তুলের দিকে দৌড় দিতে গিয়ে স্যান্ড্রিয়োর সঙ্গে ধাক্কা লাগে ওর। নৌকো থেকে পড়ে যায় স্যান্ড্রিয়ো।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডে ঘটে যায় এসব। টিনোর চোখের সামনে স্যান্ড্রিয়োর দেহের চারপাশের পানি লাল হয়ে ওঠে রক্তে। ও যখন স্যান্ড্রিয়োকে টেনে নৌকোয় তুলে আনে, ততক্ষণে স্যান্ড্রিয়োর উরুতে বিরাট একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তীরের দিকে রওয়ানা হয় টিনো। কিন্তু রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে প্রথম গাড়ি থামিয়ে আহত স্যান্ড্রিয়োকে তুলে হাভানায় যখন ও পৌঁছে, ততক্ষণে শরীরের প্রায় সব রক্তই হারিয়েছে স্যান্ড্রিয়ো।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। যে সার্জন অপারেশন করেছেন, তিনি আমাদের কোন আশাই দেননি। আমরা বুঝে গেছি, সবই এখন ঈশ্বরের হাতে। পরদিন সকাল এগারোটায় মারা গেল স্যান্ড্রিয়ো।

বাড়ির পেছনে ছোট্ট এক টুকরো জমিতে কবর দেয়া হলো ওকে। ফিউনারেলের পুরোটা সময় হাভানা বন্দরে কাটাল টিনো। ও তখনও পরে আছে দুর্ঘটনার সময় পরে থাকা সেই পোশাক। নীল ক্যানভাসের প্যান্ট আর নানা রঙের কাপড়ের তালিপট্টি মারা সাদা শার্ট। শার্টে তখনও লেগে রয়েছে রক্তের দাগ। মনে হলো যেন ঘোরের মধ্যে আছে টিনো। বাড়ি ফেরার সময় ঘুমন্ত মানুষের মতো ব্লোমের ফোর্ডে উঠল ও।

কফিনের ওপরে দুটো মাত্র ফুলের তোড়া। একটা দিয়েছে ব্লোম, অপরটা মেয়ো। টিনো ছাড়া স্যান্ড্রিয়োর আর কোন আত্মীয়স্বজন ছিল না। নির্জনতা প্রিয় লোক ছিল স্যান্ড্রিয়ো, ওর

বন্ধুর সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত কম। কোজিমারের জেলেরা শুধু ওর নাম জানত।

কিন্তু তবু, আমরা যখন ফিউনারেলে পৌঁছুলাম, দেখলাম ওর বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে প্রায় পনেরোজন মৎস্য শিকারি। তাদের কয়েকজন পরেছে নীল সুতির কোট, সদ্য ইস্ত্রি করা। রামিলিয়ো, অ্যালভারেজ, রেমিরেজকে চিনলাম আমি। ওরা আর সবার চেয়ে একটু আলাদা হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে সদ্য খোঁড়া কবরের পাশে।

আধঘণ্টায় সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে গেল। একটা ভ্যানে করে এসেছে সবাই। ভ্যানটা কোজিমারের কসাইয়ের। ফেরত যাওয়ার জন্যে ভ্যানে উঠল মৎস্যশিকারির দল। আমি, ব্লোম আর টিনো উঠলাম ব্লোমের ফোর্ডে।

গাড়ি রওয়ানা হতেই যেন ঘোর থেকে জেগে উঠল টিনো, সীটে সোজা হয়ে বসে বাড়ি আর বালুময় সৈকতের দিকে তাকাল উদাস চোখে। প্রথম এবং শেষবারের মতো ওর চোখে অশ্রু দেখলাম আমি।

পরবর্তী কয়েক দিনে নিজেকে নতুন জীবনে মানিয়ে নিল ও, যেন কিছুই ঘটেনি। আপাতত ওকে রাখছে ব্লোম। ওর পুরোনো ছোকরা চাকর চ্যাটোকে বলেছে ছেলেটার দেখাশোনা করতে। কয়েক দিন পরে টিনোকে ব্লোম ওর নৌকোটা দেখাল। জানাল ওর প্রতিদিনের কর্তব্য।

যা ঘটে গেছে তাতে মাত্র একজন মানুষই সুখী। সে হচ্ছে নিগ্রো বালক চ্যাটো। ব্লোম যখন মাছ ধরে তখন হুইল ধরে সে। কিন্তু তীরে এসে বেচারা হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ। এতদিনে সঙ্গী পেল সে।

পরের সপ্তাহে বিক্রি হয়ে গেল স্যান্ড্রিয়োর বাড়ি। নৌকোটা বাড়ির ক্রেতা বা কোজিমারের কোন জেলে, কারও কাছেই গছিয়ে দেয়া গেল না।

'কুসংস্কার,' বলল ব্লোম। 'মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত এমন কোন নৌকো ওরা ব্যবহার করতে চায় না।'

এক দিন ওটা রং করে বিক্রি করা হবে এই ধারণা থেকে বন্দরের এক কোণে নোঙর করে রাখা হলো স্যান্ড্রিয়োর নৌকো। সবাই আস্তে আস্তে ভুলে গেল ছোটখাটো সেই লোকটার কথা, যার ডান হাতের বদলে ছিল একটা লোহার হুক।

সাত

স্যান্ড্রিয়োর মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর হাভানা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। কিন্তু কোথায় যাব? হাঙর শিকারের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে আমার ক্যারিবীয়ানে এই আসা এখনও তেমন একটা ফলপ্রদ হয়নি। শুনতে যতই অবিশ্বাস্য লাগুক, আসলে কিছুই আমি দেখিনি এখনও।

ক্যারিবীয়ানের সবখানেই হাঙর শিকার চলে। হাইতি, ডোমিনিকান রিপাবলিক, মার্টিনিক, ডোমিনিকা—এমনকি বহুদূরের গুয়াদেলুপের বার্থেলেমেয়তেও হাঙর শিকার করা হয়। বার্থেলেমেয় হচ্ছে ছোট্ট একটা দ্বীপ। ওটাতে বাস করে ব্রিটন জলদস্যুদের বংশধররা। ক্যারিবীয়ানের এসব জায়গায় কিভাবে হাঙর শিকার করা হয় তা ব্লোম বা কোজিমারের কোন মৎস্য শিকারীই নিশ্চিত হয়ে বলতে পারেনি।

কোথায় যাব এবার? হাইতি, নাকি বার্থেলেমেয়তে? ঠিক করেছি যেকোন এক জায়গাতেই শুধু যাব আমি।

হাইতির সুবিধে হলো ওটা কাছে। একদিনের বাস যাত্রায় হাভানা থেকে সান্তিগো দ্য কিউবাতে পৌঁছে যাব আমি। সেখান থেকে পোর্ট অ প্রিন্সে যাব জাহাজে চেপে। কিন্তু সেন্ট বার্থেলেমেয়র একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। যত আজব লোকের আস্তানা ওই দ্বীপ।

জলদস্যুতা যখন আইনগত সহায়তা হারাল, বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ব্রিটন জলদস্যু তাদের পরিবার নিয়ে বসতি করল ওই দ্বীপে। খেদিয়ে দিল নিগ্রো আদিবাসীদের। শুরু করল চাষবাস। কাছের দ্বীপগুলোর সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই। নিজেদের মধ্যেই বিয়ে হলো তাদের সন্তানদের। ফলাফল, মারাত্মক খারাপ। বিকলাঙ্গ বাচ্চা জন্ম নিতে লাগল। কারও বা মাথা অস্বাভাবিক বড়, কারও আঙুল বেশি দুর্বল, কারও বা মাড়িতে দাঁত নেই।

নিশ্চয়ই নতুন কোন আজব পদ্ধতিতে হাঙর ধরে এঁরা। তবে শীঘ্রি আমি বুঝতে পারলাম, নিজে যদি একটা নৌকো ভাড়া না নিই, তাহলে বার্থেলেমেয়তে পৌঁছুনো চাঁদে পৌঁছুনোর মতোই কঠিন হবে। এসব ভেবে আমি প্রায় মনস্থির করে ফেললাম যে হাইতিতেই যাব। এমন সময় আমার সঙ্গে পরিচয় হলো সেনোরা দ্য মোরা'র।

কয়েক সপ্তাহ আগে রোমিলিয়ো নামের এক অভিজাত পরিবারের ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তার বাবার একটা সুগার প্ল্যান্টেশন ছিল। বাবা মারা যাবার পর সে-ই সেটার দেখাশোনা করে। জীবনটাকে আনন্দের সঙ্গে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রোমিলিয়ো। একদিন সকালে আমার দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকল সে। বলল তার সঙ্গে যেতে হবে একটা অভ্যর্থনা সভায়।

অনুষ্ঠানটা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ হলো। যে বাগানে আয়োজন করা হয়েছে সেটা এসপ্ল্যানেড দে ইনভ্যালিদের প্রায় সমান। দুইশোরও বেশি অতিথি এসেছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঝোপের আড়ালে আবডালে চেয়ার-টেবিল পাতা হয়েছে। তেমনই এক ঝোপের

আড়ালে সেনোরা দ্য মোরা বসে ছিলেন। বয়স্ক এক মহিলা, পরনে দীর্ঘ কালো গাউন। তখনও জানতাম না এই মহিলা আমার অভিযানের মোড় ঘুরিয়ে দেবেন।

সাদা রাম আর বরফ দিয়ে তৈরি কিউবানদের প্রিয় একটা ককটেল পান করছিলেন তিনি। গ্লাসটা চোখের সামনে তুলে ভেতরের তরলটুকু ঘোরাচ্ছিলেন এক মনে। হাত ধরে তাঁর এক গজ পেছনে আমাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল রোমিলিয়ো। ভদ্রমহিলা একবারও ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন না।

'লা সেনোরা দ্য মোরা,' ঘোষণা করার ভঙ্গিতে জোরাল গলায় বলল রোমিলিয়ো। 'কালাদের সেরা। কানে কিছুই শোনেন না। তবে এই দ্বীপের সবচেয়ে বড়লোক তিনি।'

পর মুহূর্তে দেখলাম রোমিলিয়ো আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দিয়েছে। পরে আমি জেনেছি কিউবার সবচেয়ে বড় কয়েকটা কফি প্ল্যান্টেশনের মালিক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। ভদ্রলোকের কয়েকটা নৌকো তৈরির ইয়ার্ডও ছিল।

'কয়েক বছর আগে,' বলল রোমিলিয়ো, 'ছোট একটা শার্ক ফিশারি কিনে এক বন্ধুকে চালানোর সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি। নিজে কিন্তু তিনি জায়গাটা একবার দেখতেও যাননি।'

বয়স্কা মহিলার দিকে ফিরল রোমিলিয়ো। স্প্যানিশ ভাষায় এক নাগাড়ে কি যেন বলল। তারপর ফিরল আমার দিকে।

'লা সেনোরা বলছেন ইচ্ছে করলে তাঁর ওখানে আপনি কয়েক দিন বেড়িয়ে যেতে পারেন। ফিশারির ম্যানেজার এখন হাভানাতেই আছে। নাম সেনোর হরনেজ। ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে আপনি ওর খোঁজ পাবেন, সেনোরার নাম বলবেন।'

দু'দিন পরে দাঁড়ালাম আমি সেনোর হরনেজের সামনে। হরনেজ লোকটা ছোটখাটো মানুষ। স্প্যানিশ চোখ দুটো মায়া ভরা। চুলগুলো লম্বা, কালো আর কোঁকড়ানো। খুব যত্ন করে গোঁফ রেখেছে। দুই প্রান্ত 'কমা'র মতো নেমে এসেছে থুতনির

গোড়ায়। আমাকে বলল আগামী কাল ফিশারিতে ফিরে যাবে সে। জানাল আমি সঙ্গে গেলে খুবই খুশি হবে।

হাভানা থেকে জায়গাটা তিরিশ মাইল দূরে, সাগর তীরে। ওখান থেকে আমেরিকার উপকূল বেশ কাছে। কাছে হওয়াটা জরুরী, কারণ মাছ যা ধরা হয় তার তিন ভাগের দুই ভাগই রপ্তানী করা হয় আমেরিকায়। বাকি অংশটুকু প্রক্রিয়াজাত করা হয় কিউবাতেই। 'ফ্লোরিডায় আমি দ্বিগুণ দামে মাছ বেচি,' জানাল হরনেজ।

গাড়িতে চড়ে চলেছি সূর্যস্নাত সৈকতের পাশ দিয়ে, হরনেজ আমাকে সংক্ষেপে জানাল কিভাবে খোলা হয়েছিল এই ফিশারি। সে নিজে সহ সাতজন, সেনোরা দ্য মোরার ওখানে কাজ করে। চল্লিশ ফিট দীর্ঘ যে নৌকো করে ফ্লোরিডার পোর্ট এভারগ্লেড্‌সে মাছ নিয়ে যাওয়া হয়, ওটার নাম লুসানিয়া। সপ্তাহে দু'বার করে আমেরিকা আসা যাওয়া করে ওটা। জাল আর দড়ি, দুই পদ্ধতিতেই মাছ ধরা হয়।

জালগুলো স্টীলের তৈরি ভারী কোন জাল নয়, যেমনটা আমি ভেবেছিলাম। (আমার ধারণা হয়েছিল কয়েকশো পাউন্ডের মাছ ধরতে হলে এবং তাদের ঝটকা আর চোয়ালের আক্রমণ থেকে জাল বাঁচাতে হলে শক্ত কিছুর তৈরি হতে হবে।) দেখলাম আমার ধারণা ভুল। জালগুলো হেম্প অথবা সুতির সুতোয় তৈরি। লম্বায় আন্দাজ একশো পঁচাত্তর ফিট, সাগরে নামিয়ে দেয়া হয় লম্বালম্বি ভাবে।

'এরচেয়ে বেশি শক্ত আর কিছু দরকার করে না,' আমাকে বলল হরনেজ। 'জালের কাছে হাঙর এলেই ওটার পেক্টোরাল ফিন লজেন্স আকৃতির খোপে আটকে যায়। পিছাতে আর পারে না হাঙর। পিছাতে পারলে ছুটে যেত। ঝাপটাঝাপটি করতে গিয়ে জালে আরও জড়িয়ে যায় ওরা। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমনই হয়,

জালে এতই জড়ায় যে শ্বাস আটকে যায় হাঙরের। যেগুলো আমরা তুলি, তার বেশিরভাগই ভোরে মরে যায়।'

আমি আরও জানলাম যে লুসানিয়া ছাড়া ফিশারির আর মাত্র তিনটা নৌকো আছে। অ্যান্টোনিয়ো হরনেজ মাছ ধরতে পারলে সেগুলো বিক্রির টাকা থেকে নির্দিষ্ট অংশের টাকা কর্মচারীদের দিয়ে থাকে।

'আমি যদি তেমন না করতাম,' বলল হরনেজ, 'সাগরে বেরিয়ে ওরা চোখের আড়ালে যাওয়া মাত্র মাছ ধরা বাদ দিয়ে তাস পেটাতে বসে যেত।'

দুপুরের খানিক আগে ফিশারিতে পৌঁছুলাম আমরা। ফিশারি অর্থ বালিময় সৈকতে মুখোমুখি দুটো লম্বা কুঁড়ে। ওখানে ঘুমায় কর্মচারীরা। এছাড়া আছে ছোট্ট একটা কাঠের জেটি, আর বিরাট একটা রেফ্রিজারেশন ঘর। লুসানিয়ায় উঠিয়ে আমেরিকা পাঠানোর আগে ওখানেই হাঙর রাখে হরনেজ। দিনের এই সময়ে, এতক্ষণে সব কয়জন কর্মচারী ফিরে এসেছে। তাদের দু'জন শেষ নৌকোটা খালি করছে। আরও তিনজন ছাউনির নিচে হাত-পা ছড়িয়ে বসে গল্পগুজব করছে। আমাকে দেখে গল্প থামাল ওরা, তাকাল নির্বিকার চেহারায়; যেন আমি নতুন কেউ নই। আমাকে বোধহয় ফিশারিজের ইন্সপেক্টর ধরে নিয়েছে ওরা।

যে কুটিরে আমার ঘুমাবার ব্যবস্থা সেজায়গার গন্ধ চিড়িয়াখানায় যে-ঘরে বুনো জন্তু রাখে একেবারে সেই রকম। আরও দুটো বিছানা, একটা টেবিল আর কয়েকটা বেঞ্চ—এই হলো ঘরের আসবাবপত্রের বাহার। হরনেজ এক কোনায় আমার ব্যাগ নামিয়ে রাখল। বলল, 'কয়েকদিন পর গন্ধটা আপনি আর টের পাবেন না।'

এরপর নিজের লোকদের সঙ্গে আমাকে সে পরিচয় করিয়ে দিল। তালিপট্টি মারা পোশাক পরা পাঁচজন লম্বা চুলো লোক

তারা। দেখে মনে হয় না একজনও গত চোদ্দো দিনের মধ্যে গোসল করেছে বা দাড়ি-গোঁফ কামিয়েছে। ট্রেজার আইল্যান্ডের বাসিন্দা ওরা। রুইয, ওরটেগা, স্যানচেয, ফার্নান্দো আর টোরিয়াল।

এই সব গন্ধযুক্ত বাকেনীয়ারদের মধ্যে ছোটখাটো এক স্প্যানিয়ার্ডও আছে। মাত্র কয়েক দিন হলো সে কিউবায় এসেছে। পরনের পোশাক এখনও ইস্ত্রি করা। নাম বলল রেইমন্ডো ডিলাকউর।

আমার ফিশারিতে আসার কারণ জানতে পেরে সবার মুখের ওপর থেকে যেন দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেল। একজন একজন করে আমার সঙ্গে করমর্দন করতে এলো ওরা। ডিলাকউর কোত্থেকে যেন বের করল এক বোতল ওয়াইন। দেরি না করে খুলে ফেলা হলো বোতলের কর্ক।

ব্যস এই। আমার হঠাৎ আগমন নিয়ে যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল তার উত্তাপ মিইয়ে যেতে পনেরো মিনিটও লাগল না। বেশিরভাগই চলে গেল কুটিরের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে। সকাল দশটার পর, যখন ওরা জাল গুটিয়ে নেয়, দীর্ঘ একটা অলস দিন পড়ে থাকে ওদের সামনে। এসময়টা ঘুমিয়ে কাটায় ওরা, অথবা তাস পিটিয়ে সময় পার করে। রাত আটটার সময় জাল নৌকোয় তুলে আবার সাগরে বেরিয়ে পড়ে ওরা।

এই সময়টাতে দড়িতে টোপও ফেলে ওরা সাগরে। অবশ্য টাকার চিন্তা কারও বেশি থাকলে তবেই শুধু দড়িতে টোপ ফেলা হয়।

আমার আগমনের দুই ঘণ্টা পর, যখন আমরা দুপুরের খাবার খাচ্ছি, মাছ যেখানে নামানো হয়, বুঝিয়ে দেয়া হয় হরনেজকে, সেই সৈকতের বালি থেকে কি যেন একটা তুলল একজন। ওটা একটা ছোট্ট জুতো। কোন বাচ্চার। আকৃতি আর রং নষ্ট হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে কোন যাঁতাকলের মধ্যে ওটাকে পেষা

হয়েছে।

রাতের শিকার যখন ওরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে সৈকতে ফেলছিল তখন একটা হাঙর বমি করে ওটা বের করেছে, বলল একজন। খুব মনোযোগ দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জুতোটা দেখল হরনেজ।

'যদি জানতে পারতাম কোথায় হাঙরটা এটা পেয়েছে,' কেমন যেন বিষণ্ন শোনাল হরনেজের কণ্ঠ। 'প্রায়ই ভাবি···আমি যেসব জিনিস হাঙরের পেটে পাই তা নিয়ে কিছু একটা লিখব। অদ্ভুত একটা বই হবে ওটা। জানো, সেনোর, এক বছর আগে–তখন আমরা আস্ত হাঙর পাঠিয়ে দেয়ার বদলে নিজেরাই পেট চিরে টুকরো করতাম–বিরাট এক খণ্ড হীরে পেয়েছিলাম আমি একটা নীল হাঙরের পেটে। প্ল্যাটিনামের একটা রিঙে বসানো ছিল ওটা। মাদ্রে দি দিয়োস! আমি ভেবেছিলাম বুঝি প্রাচুর্যের মুখ দেখতে আর দেরি নেই। লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে হাভানায় ছুটলাম আমি, হাজির হলাম এক জুয়েলারির দোকানে। কিন্তু রিংটা আসলে ছিল রুপোর, আর হিরেটা নকল!

'আরেকদিন হাঙরের পেটে একজন লোকের হাত পেলাম আমি। আস্তই ছিল, তবে সাগরের পানিতে একটু কুঁচকে গিয়েছিল চামড়া। কনুইয়ের ওপর থেকে ছেঁড়া জ্যাকেটের হাতা তখনও লেগে ছিল হাতটাতে। মানুষের অবশিষ্টাংশ পেলে সব সময়ই আমরা তা পুলিশের কাছে নিয়ে যাই। এবারও গেলাম। ফর্মালডিহাইডে হাতটা চুবিয়ে রাখল ওরা। বলল সেদিনই তদন্ত শুরু করবে। এধরনের তদন্ত সব সময় একই রকম ভাবে শুরু করা হয়। গত কয়েকদিনে গায়েব হয়ে গেছে এমন লোকদের একটা লিস্টি তৈরি করে পুলিশ, তারপর যা পেয়েছে সেটার সঙ্গে কার মিল আছে সেটা খুঁজে বের করে। এবার জানা গেল যে গত কয়েক দিনে মাত্র একজন লোকই অদৃশ্য হয়েছে বলে রিপোর্ট পাওয়া গেছে। ধনী এক আমেরিকান সে। নাম জন ফিলবার। নিজে ছোট্ট একটা প্লেন চালিয়ে মায়ামি থেকে নিকারাগুয়াতে

যাচ্ছিল। ধরে নেয়া হয় সে ক্যারিবীয়ানে এসেছিল। হাতটা মায়ামিতে পাঠানোর কথা ভাবছিল পুলিশ, কিন্তু আমি বলি যে আমিই ওটা পৌঁছে দেব। আমার জন্যে ব্যাপারটা কোন সমস্যা নয়। সপ্তাহে দু'বার ফ্লোরিডা যায় লুসানিয়া।

'হাতটা জন ফিলবারেরই ছিল। কব্জিতে একটা ক্ষতচিহ্ন দেখে হাতটা শনাক্ত করা হয়। দূর সম্পর্কের কয়েকজন আত্মীয়ই শুধু ছিল তার। ফিলবারের মৃত্যুতে আচম্বিতে বড়লোক হয়ে গেল তারা।

'একমাস পর,' কথার ইতি টানল হরনেজ, 'মায়ামি থেকে পোস্ট করা একটা চিঠি আমি ফিশারিতে বসে পেলাম। জন ফিলবারের জন্যে কষ্ট করেছি বলে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে লেখা চিঠি। সময় নষ্ট হয়েছে বলে সেই সময়ের ক্ষতিপূরণও দেয়া হয়েছে। চিঠির সঙ্গে ছিল এক হাজার ডলারের একটা চেক।'

একটা পাথরের ছায়ায় বসে ফিশারিতে আমার প্রথম বিকেলটা পার করে দিলাম। গল্প হলো হরনেজের সঙ্গে। অল্প অল্প সাদা রাম চলল গল্পের ফাঁকে ফাঁকে। সূর্যের তাপে ক্লান্ত হয়ে আমাদের চারপাশে ছায়ায় শুয়ে আছে জেলেরা। রোদ আর মাছির হাত থেকে বাঁচার জন্যে মাথার টুপি চোখের ওপর টেনে রেখেছে। সাগরটাকে ঝকমকে রুপোর একটা বিস্তৃতি মনে হচ্ছে। জেটিতে নোঙর করা আছে নৌকোগুলো। চারদিক একদম স্থির। আজকে একফোঁটা বাতাসও বইছে না।

এক বছর আগে, হরনেজ বলল আমাকে, ফিশারির ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব যখন ও নেয়, তখন প্রতিদিন পঞ্চাশটারও বেশি হাঙর নিয়ে ফিরত জেলেরা। 'মাছের পরিমাণ কমে গেছে,' বলল হরনেজ, 'উপকূলের অন্য কোন দিকে সরে যাওয়ার কথা ভাবছি আমরা।' (সরে যেতে হয়, এটাই হচ্ছে বাড়ি-ঘর পাকাপোক্ত করে না গড়ার কারণ। এখন যদি সরে যেতে হয়, মাত্র

দু'দিন লাগবে বাড়ি-ঘর সব খুলে নিয়ে বাক্স-পেটর বেঁধে রওয়ানা হয়ে যেতে।)

এখানেই, হরনেজ আসার কয়েক সপ্তাহ পরে অস্বাভাবিক একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিল সে। ডিনামাইট দিয়ে হাঙর শিকার করতে চেয়েছিল। ওর এক বন্ধু মিলিটারি পাইলট। প্রায়ই সে নিচ দিয়ে উড়ে যায়। খেয়াল করে দেখেছে রোদেলা দিনে পানি যেখানে পরিষ্কার, সেখানে বিশ-তিরিশ ফ্যাদম গভীর পর্যন্ত সহজেই নজর চলে। দেখা যায় হাঙরের দল সাঁতার কাটছে। ওই পাইলট বন্ধুই হরনেজকে বিস্ফোরক ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই বোঝা গেল পরিকল্পনাটা কার্যক্ষেত্রে উপযোগী নয়। সাধারণ মাছ, যেগুলোর ব্লাডার বাতাসে ভরা থাকে, সেগুলো বিস্ফোরণে মারা গেলে ভেসে ওঠে, কিন্তু হাঙর ডুবে যায় ভারী সীসের মতো। রাইফেল দিয়ে হাঙর শিকার করা আর বিস্ফোরক দিয়ে হাঙর শিকার করা একই। শিকার করা যাবে, কিন্তু তুলে আনা যাবে না।

সন্ধের পরে যার যার জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। নৌকো যাত্রার উপযোগী করে তুলতে লাগল। রাতের খাওয়ার পর হরনেজ আর অরটেগার পাশে থাকলাম আমি। অরটেগা একই সঙ্গে মৎস্য শিকারি এবং রাঁধুনি। গা ভরা লোম ওর, বানরকেও হার মানিয়ে দেয়। দেহটা হিমশৈলের মতো প্রকাণ্ড। বিরাট বড়লোক হয়ে যেতে পারত ও হলিউডে গিয়ে আধুনিক কিংকং সাজার সুযোগ পেলে। হাতের তালু দুটো ওর টেনিস র‍্যাকেটের মতো বড়। তীর থেকে দশ মাইল দূরে সরে আসার পর এঞ্জিনের গতি কমাল ও। আধঘণ্টার মধ্যেই পাঁচটা জাল সাগরে ফেলে দেয়া হলো। প্রতি নৌকোয় পাঁচটা করে জাল আছে। এরপর টিলার নাড়াচাড়া করে কয়েকশো গজ দূরে নিয়ে নৌকো থামাল কিংকং। এবার শুরু করল ও তার 'মার্কেটিং'।

কাজ শুরু করল দুটো খুঁটির মাথায় খাড়াভাবে ছয় বর্গ ফিটের একটা জাল বিছিয়ে। তারপর জালের মাঝখানে ঝুলিয়ে দিল শক্তিশালী একটা ইলেক্ট্রিক লণ্ঠন। এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়েস করে বসল ও। হাবেভাবে বুঝিয়ে দিল এখন অপেক্ষা করা ছাড়া করার মতো আর কোন কাজ নেই। দশ মিনিট অপেক্ষা করলাম আমরা, তারপর খেয়াল করলাম জালে পরপর কয়েকটা ঝাঁকি লাগল। আলোর আকর্ষণে ছুটে আসছে উড়ুক্কু মাছ, টপটপ পড়ছে এসে নৌকোর ওপর, আমাদের পায়ের কাছে। কিংকং রাঁধে ওগুলো। স্বাদ ভাল নয়, কিন্তু সান্ত্বনা পাওয়া যায় এই ভেবে যে অন্তত হাঙর খেতে হচ্ছে না।

পরদিন ভোরে জীবনে প্রথম জাল তুলতে দেখলাম আমি। গড়ে প্রতিটা জালে দুটো করে হাঙর ধরা পড়েছে। বেশিরভাগই জালে জড়িয়ে গিয়ে আগেই দম আটকে মারা গেছে।

প্রতিটা নৌকোয় প্রাচীন একটা করে ক্রেন মতো আছে। ওটা দিয়ে হাঙর আর জাল তোলা হয়। হাঙরকে প্রথমে জাল থেকে ছাড়ানো হয়। খুব একটা সমস্যা হয় না সাধারণত। তবে দুটো হাঙর যদি একই জালের খুব কাছাকাছি জায়গায় আটকায়, আর জীবিত থাকে, তাহলে সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা প্রায় একশো ভাগ। সেক্ষেত্রে জাল টেনে আনার সময় পরস্পর লড়াই বাধিয়ে দেয় ওগুলো। হাঙর তো ছুটে যায়ই, জালও ছিঁড়ে নিয়ে যায় সঙ্গে করে।

অ্যান্টোনিয়ো হরনেজ আমাকে বলল যে হাঙরের ব্যথার বোধ খুব কম। সেজন্যেই পরস্পরকে আক্রমণ করলে সে আক্রমণ হয় ভয়াবহ। আমরা যে আঘাতে মারা পড়ব সে আঘাতে হাঙরের কিছুই হয় না।

কয়েক দিন আগে ও যখন দুই দানবকে নৌকোয় তুলে আনার চেষ্টা করছে, বড়টা ছোটটাকে আক্রমণ করে বসল। ছোটটার লেজ থেকে দেহের প্রায় অর্ধেকটা গিলে ফেলল বড়টা। জেলেরা

চেষ্টা করল ওটাকে ছাড়াতে, কিন্তু কাজে এলো না ওদের কোন বুদ্ধি। শেষ পর্যন্ত হাঙরটাকে কেটে দু'টুকরো করতে হয়েছিল।

এধরনের কোন দুর্ঘটনা আমার চোখে পড়েনি। হরনেজের দলের সঙ্গে সাগরে বেরিয়ে আমি শুধু অনুভব করেছি কাজের নির্দিষ্ট একটা বহমান ছন্দ। সে ছন্দ আমাদের ছন্দের চেয়ে অনেক আলাদা, অনেক ধীর এবং প্রশান্তি মাখা।

প্রতি ভোরে সাগরে বেরিয়ে পড়া, ফিরে আসা নটা কি দশটায়। হিমাগারে আন্দাজ বিশটা হাঙর তুলে রাখা, তারপর কোন না কোন ভাবে সময় কাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা। জেলেদের কুটিরের ভয়াবহ দুর্গন্ধ শীঘ্রি আমার নাকে সয়ে গেল। বড় একটুকরো পুরোনো সাবান পড়ে আছে এক কুটিরে। আগে ওটার ব্যাপারে আমার কৌতূহল ছিল, এখন দেখলাম তাও মরে গেছে। শুধু ইচ্ছে হয় কেউ একজন সাবানটা ব্যবহার করে পরিচ্ছন্ন হোক।

দশ-বারোদিন এখানে কাটানোর পর আবার হাভানায় ফিরে যাব কিনা ভাবতে শুরু করলাম আমি। কিন্তু আমার যাওয়া হলো না। এমন এক ঘটনাপ্রবাহ শুরু হলো যে-ঘটনা আর এক সপ্তাহ পরে প্রতিটা কিউবান নিউজ পেপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হবে।

আট

সে দিন সন্ধে আটটার সময়ে আকাশ ঢেকে গেল ঘন কালো মেঘে। বুঝতে বাকি থাকল না যে বজ্রবৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

সাগর যেহেতু পুকুরের পানির মতো শান্ত, তাই জাল ফেলতে নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। নিরাপদেই ফিরে এলাম দশটা নাগাদ। সানচেয্ ফিশারির পাহারায় ছিল; আমরা ফিরে আসার পর জানাল নিজে ও কয়েকটা লাইন ফেলে দেখতে চায়। আমরা যখন পোকার খেলা নিয়ে ব্যস্ত, সানচেয্ বেরিয়ে গেল নৌকো নিয়ে।

মাঝরাতে, খেলা যখন প্রায় শেষের পথে, আমরা একটা এঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেলাম। ফিরে এসেছে সানচেয্। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, কারণ মাঝেমধ্যে যখন ও দড়ি ফেলতে যায়, তখন ফিরতে সময় নেয়; রাত তিনটা-চারটের আগে ফেরে না বললেই চলে। সানচেয্ জেটিতে ভেড়ার সময় সৈকতে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। এক চিলতে বাতাস নেই কোথাও। মেঘের পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নক্ষত্র রাজি। ঝড়ের ভয়ে সানচেয্ তাড়াতাড়ি ফিরেছে তা হতে পারে না।

লাফ দিয়ে সৈকতে নামল সানচেয্, হাতে দুটো দড়ি, বুকের কাছে ভাঁজ করা। আমাদের দেখাল ওগুলো। দেখলাম দড়ির মাথায় কোন বড়শি নেই। মনে হলো ভোঁতা কিছুর ঘষায় ক্ষয়ে গেছে।

হুক হারানোটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সানচেয্কে দেখে বোঝা যাচ্ছে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে। মোটাসোটা বেঁটে লোক সানচেয্। ঘাড়ের ওপর গলা নেই, কাঁধের ওপর মাথাটা বসে আছে যেন একটু বাঁকা হয়ে। কথা বলে খুব ধীরে। শব্দ চয়নে প্রচুর সময় নেয়। মনে হয় অন্তরের গভীর অতল থেকে শব্দ হাতড়ে আনতে খুব কষ্ট হচ্ছে। আজকে কথা প্রায় বন্ধ ওর। চোখে বিস্ময়াহত দৃষ্টি। আমাদের জানাল:

সাগরে বেরোনোর এক ঘণ্টা পরে তীর থেকে আন্দাজ দশ মাইল দূরে নৌকো থামায় ও। কোজিমারের জেলেদের মতো করে দড়ি ফেলে সাগরে। ছয়টা দড়ি, প্রতি দুটোর সঙ্গে একটা করে

সাদা বয়া। কাজ শেষে একটা সিগারেট ধরায় ও।

রাতটা যদিও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হওয়ার হুমকি দিচ্ছে, তবুও সার্চলাইট ছাড়াই দড়ির মাথায় বয়া আর কেরোসিনের বাতি ঠিকই দেখতে পাচ্ছে ও। বয়ার খুব কাছেই নৌকো রেখেছে সানচেয্। সাগরের ঢেউগুলো ধীরে ধীরে নৌকো দোলাচ্ছে। সাগর দেখে মনে হচ্ছে চারপাশ থেকে ফুলে উঠছে আস্তে আস্তে।

পানির গভীরতা ওখানে গড়ে পঞ্চান্ন ফ্যাদম। পাঁচশো পাউন্ডের হাঙর প্রায়ই ধরা পড়ে। আজকের আবহাওয়া মৎস্য শিকারের জন্যে অত্যন্ত উপযুক্ত। সানচেয্ প্রায় নিশ্চিত যে রাতটা মাটি হবে না।

প্রথম বয়াটা ডুবে যাওয়ার দশ সেকেন্ড পরেই জায়গা মতো পৌঁছে গেল সানচেয্, দড়ি দুটো ধরে অবস্থা বোঝার চেষ্টা করল। সন্দেহ নেই, বড় কোন মাছ আটকেছে বড়শিতে।

হাতের দড়িতে ধীর কিন্তু জোরাল টান অনুভব করল সানচেয্। তবে মাছটা হাঙর বা সাধারণ কোন মাছ নয় এটা বুঝতেও অসুবিধে হলো না ওর। এই ধরনের টান হাঙর বা সোর্ডফিশ দেয় না। বয়াটা হঠাৎ করে পানির তিন ফিট নিচে তলিয়ে গেল না, বরং ধীরে ধীরে, কোন ঝাঁকি না দিয়ে ডুবতে লাগল। হাঙর দড়িতে ঝাঁকি মারে, কিন্তু এই মাছ তা করছে না। প্রথম কয়েক মুহূর্ত দড়িতে আর কিছুই অনুভব করল না ও। মনে হলো মস্ত একটা দানব দড়ি কামড়ে নিশ্চুপ বসে আছে সাগরের তলায়।

'দশ সেকেন্ড ওরকম কাটল,' বলল সানচেয্। 'তারপর মনে হলো বড়শি কোন পাথরে আটকেছে। টানছি আমি, সেই সঙ্গে একটু একটু করে সরছে নৌকো, আমার সুবিধে হয়ে গেছে। জোর এক টান দিলাম দড়িতে, কিন্তু কয়েক ইঞ্চির বেশি টেনে আনতে পারলাম না। তারপর আবার দড়ি টেনে নেয়া শুরু হলো।'

সেই সঙ্গে কাঁপুনি উঠে গেল দড়িতে। সানচেয্ বুঝতে পারল

ওর দড়ি কোন পাথরে আটকায়নি, আটকেছে জীবিত কোন মস্ত ওজনদার প্রাণীর গায়ে। নৌকোর খোলে পা বাধিয়ে দু'হাতে দড়ি টানতে লাগল ও।

'কয়েকটা সেকেন্ড মনে হলো বিশাল কিছু তুলে আনছি সাগরের অতল থেকে। হুঁশ ফিরতে দেখলাম পড়ে আছি নৌকোর খোলে চিৎপাত হয়ে, হাতে ছেঁড়া দড়ি।'

উঠে সার্চলাইট দিয়ে নৌকোর আশেপাশের পানিতে আলো ফেলে দেখল সে। 'কিছুই ছিল না, কালো শূন্যতা ভরা সাগর ছাড়া,' বলল সানচেয্। 'বয়াগুলো নড়ছে না বললেই চলে। এভাবে আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর আরেকটা বয়া ডুবে গেল।'

এটাও ধীরে ধীরে ডুবতে লাগল, দেখে মনে হলো কিছু একটা গভীর সাগরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দড়ি ধরে টানাটানি করল সানচেয্। এবারও আগেরবারের মতোই ছিঁড়ে গেল দড়ি।

'আর অপেক্ষা করলাম না আমি,' বলল সানচেয্, 'এঞ্জিন চালু করে ফিরে এলাম এখানে।'

বেশ কয়েক সেকেন্ড এক জন আরেক জনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল জেলেরা। হরনেজের হাতে তখনও পোকার-কার্ড। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওগুলো পকেটে পুরল সে। বলল, জিনিসটা বিশাল কোন অক্টোপাস না হয়ে যায় না।

মানতে পারল না সানচেয্। বলল, 'আমার তা মনে হয় না।' এর আগেও বড় অক্টোপাস ধরেছে সে। একটা তো হুকে আটকেছিল যেটার শুঁড় ছিল তেরো ফিটের বেশি। ওটাকে তাড়াতে দুনিয়ার ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল ওকে। এত বড় জন্তু, না পারবে মারতে, না পারবে নৌকোয় তুলতে। ভারেই ডুবে যাবে নৌকো। 'উঁহু,' মাথা নাড়ল সানচেয্, 'অক্টোপাস ওভাবে দড়ি টানে না।'

হরনেজ বলল, 'অজানা কোন দানব যদি মানতে না পারো

তাহলে অক্টোপাসই এক মাত্র ব্যাখ্যা।' জানাল আগামী দিন ও নিজে গিয়ে ওই জায়গায় দড়ি ফেলে চেষ্টা করে দেখবে।

আমি সবার ওপর চোখ বোলালাম। সানচেয্‌কে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। হরনেজের ব্যাখ্যায় একজনও সন্তুষ্ট নয়। ক্যারিবীয়ানে আজ বিশ বছর হলো মাছ ধরছে সানচেয্‌। সে যদি বলে ওটা অক্টোপাস ছিল না, ওভাবে অক্টোপাস দড়ি টানে না, তাহলে বলতেই হয় আসলেই ওটা অক্টোপাস ছিল না।

হাতে হাতে ঘুরতে লাগল ছেঁড়া দড়ি দুটো। মগ্ন হয়ে গেল প্রত্যেকে। গালে না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বড় লণ্ঠনটার আলো পড়েছে সৈকতে, সেই আলোয় ওদের ছায়া পড়েছে হলুদ বালিতে, দেখে মনে হচ্ছে হাতের দড়িটা পার্থিব কোন কিছু নয়, যেন ভিন গ্রহ থেকে পড়া রহস্যময় কোন যন্ত্র পরীক্ষা করে দেখছে ওরা। হরনেজ ঘুমাতে চলে গেল, কিন্তু আমি জেলেদের সঙ্গে আড্ডায় মজে রয়ে গেলাম আরও একটি ঘণ্টা।

ঝড়টি যে প্রচণ্ড হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখনও শুরু হয়নি, অথচ আকাশে বিদ্যুতের দৌড়োদৌড়ি প্রবল হয়ে উঠল, সাপের মতো এখানে ওখানে ছোবল দিতে লাগল ঝকঝকে সাদা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ। কুঁড়ে ঘরে শোওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। যে কোন সময়ে বাজ পড়তে পারে। আমি একটা কম্বল নিয়ে সৈকতে বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। এখানে ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম। আরও তিনজন আমাকে অনুকরণ করল। ঘুমাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুম এলো না। কিছুক্ষণ পর দেখলাম কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়েছে অরটেগা।

'হরনেজ বলেছে সে নিজে কাল মাছ ধরতে যাবে। কিন্তু কাল বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে।' আমার দিকে ফিরল অরটেগা। বাজে ইংরেজিতে জানতে চাইল, 'তোমার কি ধারণা, ফ্রান্সের মানুষ?' ওর বলার ভঙ্গি দেখে আমার ধারণা হলো অপেক্ষা করছে ও, কেউ

ওর মতে সায় দেবে। একা ওখানে, সাগরের গভীরে ফিরে যাওয়া ওর কাছে সুবিধের কাজ বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু আর কেউ যদি সঙ্গে যায়... 'ওখানে আমরা এখনই একবার যেতে পারি,' বলে ফেললাম আমি। বলেই আফসোস হলো যে কেন একথা বললাম, কিন্তু ছোঁড়া তীর ফেরানো যায় না। এই পরিকল্পনায় উন্মাদ ছাড়া আর কেউ সায় দেবে না। সত্যি যদি সানচেযের কোন ভুল হয়ে থাকে, বড় কোন অক্টোপাসকে যদি ও হুকে আটকে থাকে, তাহলে সাগরের ওখানে ফিরে যাওয়ার ঝক্কি পোহানোর কোন অর্থই হয় না। কিন্তু, আসলেই যদি সানচেযের হাত দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ওটা কোন অজানা দানব হয়, তাহলে বারো ফুটি একটা নৌকোয় তিনজন লোকও ওটার মুখোমুখি হবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। দুর্যোগপূর্ণ রাতটা আমি গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করলাম। রাতের আকাশে দানবের মতো বড় মেঘের দল একটার গায়ে আরেকটা আছড়ে পড়ছে। নিচে কুচকুচে কালো অশান্ত সাগর ফুঁসছে। প্রতি দশ সেকেন্ডে দিগন্তে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুতের ঝিলিক, আকাশ চিরে দিচ্ছে।

সানচেয সাগরের যেখানে দুটো দড়ি ফেলেছিল সেখানে আমি আর অরটেগা মিলে ফেললাম বারোটা। বড় একটা ফ্লেয়ার নিয়ে এসেছে অরটেগা। ওটা নৌকোর গলুইয়ে বসাল ও। একঘণ্টার বেশি হয়ে গেল আমরা পানির ওপর বিভিন্ন জায়গায়, বয়াগুলোর ওপর সার্চলাইট ফেললাম, কিন্তু একটা বয়াও নড়ল না। পরদিন সকালে হরনেজ নিজে চেষ্টা করে দেখল। ওর কপালও খুলল না। পরবর্তী তিনদিন জেলেরা সবাই দড়ি ফেলে দেখল, কোন লাভ হলো না। সানচেযের দানবটা যেন হারিয়ে গেছে সাগরের অতলে।

তারপরই সেই ঘটনা ঘটল। কিউবার সমস্ত খবরের কাগজের মনোযোগ আকৃষ্ট হলো আমাদের ফিশারির দিকে। শ্যেনদৃষ্টিতে আমাদের কার্যকলাপ নজরে রাখল ওরা।

*

ডিলাকউর, কিউবাতে নতুন আসা সেই স্প্যানিয়ার্ড, যাকে হরনেজ কয়েকমাস আগে সাগরে দড়ি ফেলার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছে, সে-ই এখবরের মূল নায়ক। তখন রাত বাজে একটা। তিনটা ধাতুর বয়া ওর নৌকো থেকে তিরিশ গজ দূরে পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। দুটো দড়ি একটা আরেকটার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে; ওগুলোর মাথায় যে টোপ আছে, সেগুলো পানির পঞ্চাশ ফ্যাদম নিচে। বয়াগুলো নৌকোর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে এক আঙুল মোটা দড়ি দিয়ে।

প্রথম বয়া যখন টান খেয়ে ডুবল, ওটা ডুবল খুবই দ্রুত। অত্যন্ত শক্তিশালী কিছু একটা টেনে নিয়ে গেল ওটাকে। ডিলাকউরের ধারণা হলো বিশাল একটা হাঙরের সঙ্গে বোধহয় লড়তে হবে। কিন্তু এঞ্জিন মাত্র স্টার্ট দিয়েছে সে, এমন সময় আরও দুটো বয়া একই সঙ্গে ডুবে গেল। নৌকোয় বাঁধা দড়ি আচমকা টানে শক্ত হয়ে উঠল, টান খেয়ে নৌকোটা অন্ধকার সাগরের দিকে ছুটল। বুদ্ধি করে দড়ি কেটে দিল ডিলাকউর, নাহলে সেরাতে নৌকোডুবিতে মারা যেত লোকটা।

কয়েক সেকেন্ড পরেই সাগর আবার শান্ত হয়ে গেল। চারপাশে আলো ফেলে খুঁজল ডিলাকউর, কিন্তু বয়া তিনটের একটাকেও আর সাগরের ওপরে দেখতে পেল না। যেখানে ডুবেছিল সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে দু'দিন পর পাওয়া গেল বয়াগুলোকে। দেখে মনে হলো হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েছে কেউ। একেবারে তশতরীর মতো চ্যাপ্টা হয়ে গেছে বয়া। আঁচ করা গেল কারণটা। ওগুলোকে পানির অনেক গভীরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতই গভীরে যে পানির চাপে ওই অবস্থা হয়েছে ওগুলোর।

ছয়টা দড়ির দুটো তখনও বয়াগুলোর সঙ্গে বাঁধা। তৃতীয়টা হুক থেকে তিন ফিট দূরে কাটা পড়েছে। দড়ির কাটা জায়গাটা

আমাদের বেশি উত্তেজিত করল। চট করে মাঝখান থেকে ছিঁড়ে যায়নি দড়ি, যেমনটা যায় হঠাৎ প্রচণ্ড টান খেলে অথবা হাঙরের জোর কামড় পড়লে। ক্ষয়ে গেছে যেন। রোঁয়াগুলো বেরিয়ে এসেছে।

কোন হাঙরের সাধ্য নেই অমন ভাবে দড়ি কাটে। তাছাড়া অত দ্রুত বয়া টানা বা সেগুলোকে সাগরের অত গভীরে নিয়ে যাওয়ার সাধ্যও কোন হাঙরের নেই। হরনেজ, যে কিনা সানচেযের ব্যাপারটা সন্দেহের চোখে দেখেছিল, এবার তারও টনক নড়ল।

দুটো মাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আছে এই ঘটনার। এত গভীরে বয়া নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে মাত্র দুই জাতের প্রাণী । এক, মান্টা রে–যেমন আকৃতির রে আমি দেখেছিলাম কোজিমারের উপকূলে। আরেকটা হতে পারে ক্যাশেলট তিমি। 'কিন্তু এদিকের সাগরে কখনও ক্যাশেলট তিমি এসেছে আমি শুনিনি,' আমাকে বলল হরনেজ। 'আর মান্টা রে এভাবে টোপের দিকে ছুটে যায় বলেও আমার জানা নেই।'

সানচেয আর ডিলাকউরের ঘটনার পর একটাই মাত্র করণীয় আছে। সেটাই করল হরনেজ। পরদিন তিনজন জেলে হাভানার উদ্দেশে যাত্রা করল। সেদিন ছিল শনিবার। আমার মনে আছে, কারণ ট্রাকে ওঠার আগে সপ্তাহে সেদিনই প্রথমবারের মতো জেলেরা হাত-মুখ ধুয়ে নিজেদের পরিষ্কার করেছিল। শুধু ওরাই চেনে এমন সব আড্ডায় গেল জেলেরা। সপ্তাহে একদিন এসব জায়গায় গিয়ে ফুর্তি করাটাই ওদের জীবনের একমাত্র আনন্দ। সোমবার সকালে ফিরল তারা। এরমধ্যে ঘুমিয়েছে খুবই কম, আলাপ করে সময় পার করেছে বেশি। সঙ্গে নিয়ে এসেছে কিউবার অন্যতম দৈনিক এল ডিয়ারিয়ো ন্যাশিয়োনালের এক সাংবাদিককে। দিনটা ফিশারিতে কাটাল লোকটা। দু'দিন পরে পঞ্চাশ হাজার কিউবান নাস্তার টেবিলে জানল যে বিশাল এক দানব ঘুঁরে বেড়াচ্ছে দ্বীপের চারপাশের প্যানিতে। ওটা সাধারণত

থাকছে পানির একশো হতে একশো পঞ্চাশ ফ্যাদম গভীরতায়।

প্রথম পাতায় প্রকাশিত হলো আর্টিকেলটা। ওপরে রেইমন্ডো ডিলাকউর আর তার তিনটে চ্যাপ্টা বয়ার ছবি। হেডলাইনে লেখা হলো: এল সিউয়েরটো ফিশারিজের সবার ধারণা মাছটা অত্যন্ত বড় এবং দ্রুতগতির। আরও বলা হলো যে জেলেদের ধারণা দানবটা অজানা প্রজাতির। আর্টিকেলের শেষে থাকল কিউবার এক অভিজ্ঞ ডুবুরির মন্তব্য। তার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করলে দাঁড়ায়:

'সাগরের গভীরে যে দানবের দল ঘুরে বেড়ায় তাদের সব কয়টার প্রজাতি নির্ণয় আমরা করতে পেরেছি এটা কেউ ভাবলে বোকামি হবে। এমনও প্রজাতির মাছ থাকতে পারে সাগরের গভীরে যেগুলোর আকৃতি বা শক্তি সম্বন্ধে হয়তো আমরা একেবারেই অজ্ঞ। এল সিউয়েরটো ফিশারিজের দানবটা হয়তো এমনই কোন অজানা প্রজাতির।'

জেলেরা খবরের কাগজটা হাতে হাতে নেড়েচেড়ে পড়ে দেখল। মাথা দোলাল সায় দিয়ে। অভিজ্ঞ ডুবুরির মতামত ওদের খুশি করেছে। এই মতামতের আগে পর্যন্ত নিজেরা ওরা সন্দিহান ছিল, কিন্তু কাগজে খবর প্রকাশ হওয়ায় ওদের মনোভাব এমন হলো যেন চোখের সামনে দানবের লেজ দেখতে পেয়েছে। সাগরের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাতে শুরু করল ওরা।

কয়েক দিনের মধ্যেই আরও কয়েক জন সাংবাদিক ফিশারিতে চলে এলো। এরপর এলো ঘটনাস্থল দর্শনার্থীর দল। কিছু এলো গাড়িতে করে; প্রখর সূর্যের আলোয় রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফিশারিজের দিকে কিছুক্ষণ কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকল তারা, তারপর যেন হতাশ হয়েই চলে গেল। অন্যরা এলো মৎস্য শিকারীদের সঙ্গে কথা বলতে। ওরা জানাল হাভানার মানুষ অন্য প্রসঙ্গে কথা বলাই ছেড়ে দিয়েছে। সমস্ত কিউবা জানে এই ঘটনার কথা। সানচেয্ আর ডিলাকউর গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ত লোক হয়ে উঠল।

আবার কোন দানবের আবির্ভাব না ঘটায় মাছ ধরা চলতে লাগল, কিন্তু যেন হারিয়ে গেছে আগের উৎসাহ। বিকেলে যখন জাল ফেলা হয়, ফিরে এসে সৈকতে তাস পেটানোর বদলে জেলেরা পরস্পরকে শোনায় অদ্ভুতুড়ে সব গল্প।

ক্যারিবীয়ানের বিশালকায় অক্টোপাসের কথা বলে ওরা, সেই মাছ পঞ্চাশ ফিট ব্যাসের, বিশ ফিট লম্বা নৌকো টেনে ডুবিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। ইচ্ছে করলে শুঁড় বাড়িয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মারতে পারে যে কোন মানুষকে। ওরা বলে, এসব দানব কখনও পানির ওপর ভেসে উঠে চেহারা দেখায় না, তবে যে রাতে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে সে-রাতের কথা ভিন্ন। তখন পানির সমান্তরালে নিজেদের ফসফোরেসেন্ট চোখ তুলে আনে ওরা। এরা হাঙরের মতোই দ্রুতগতি সম্পন্ন। ভয় পায় শুধু ক্যাশেলট তিমিকে, এ ছাড়া শুঁড়ের নাগালে যাকে পায় আক্রমণ করে বসে। বেশ কিছু তিমি ধরা পড়েছে যেগুলোর গায়ে পাওয়া গেছে অস্বাভাবিক বড় চোষক।

টোরিয়াল স্যান্টিগো ডি কিউবা থেকে এসেছে। মাছ ধরতে শুরু করার আগে কাজ করেছে ও মেক্সিকান বুল-রিঙে। ও বলল মেক্সিকোর প্রত্যন্ত উপকূলে এমন সব দানবাকৃতি প্রাণী দেখা গেছে যেগুলোকে আগে কখনও প্রজাতিভুক্ত করা হয়নি। ওগুলোর সঠিক বর্ণনাও পাওয়া যায় না, কারণ মাইলখানেকের ভেতরে যাওয়ার সাহস কেউ করেনি। তবে বলা হয় তাদের শরীর ছিল গোলাকৃতি, তাতে হলুদ রেখা। অক্টোপাসের মতো শুঁড় আছে। যখনই জানা যেত ওগুলোর একটা তীরের কাছাকাছি আছে, সাগরে যাওয়া কয়েক দিনের জন্যে বন্ধ করে দিত জেলেরা।

স্যান্টিগোর কাছে কিউবাতে একবার এক দুর্গ থেকে মেশিনগান ছোঁড়া হয়েছিল তীরের কাছে চলে আসা এক অজানা দানবের দিকে। দানবটা তীর থেকে তিরিশ-চল্লিশ গজ দূরে মাথা জাগিয়েছিল। বুলেটে ওটার কোন ক্ষতিই নাকি হয়নি। দু'তিনবার

সেই জায়গাতে ঘুরে ঘুরে সাঁতার কাটে ওটা, তারপর ধীরেসুস্থে আলস্য ভরে চলে যায় পানির নিচে।

কখনও কখনও সেই ভোর পর্যন্ত মৎস্য শিকারীদের মধ্যে এসব গল্প চলতে লাগল, সঙ্গে চলল ছোট ছোট গ্লাসে সাদা রাম। এই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে কিছু করল না ওরা, কিন্তু গল্প বলে বলে বাড়িয়ে তুলল রহস্যের প্রভাব; অস্বস্তিতে ভুগতে লাগল নিজেরাই।

রাতে যখন তাদের নাক ডেকে ঘুমাবার কথা, তখন সৈকতে হাঁটতে লাগল ওরা, বারে বারে ফিরে তাকাল সাগরের দিকে। এক শেষ দুপুরে বেশ জ্বর নিয়ে বিছানায় গেলাম আমি। সেই সকালেই একটা হুকের সঙ্গে জোর এক বাড়ি খেয়েছি, বোধহয় জ্বর এসেছে সেকারণেই। হঠাৎ বিশাল একটা কিছুর উপস্থিতি অনুভব করলাম; লম্বা, নরম গোছের একটা কিছুর, সৈকতের বালির ওপর দিয়ে গা ঘষে এগিয়ে আসছে, তারপর আধখোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল অক্টোপাসের মতো শুঁড়—স্পর্শ করল আমার কাঁধ। চমকে উঠে বসলাম আমি। সারা শরীর ঘামে জবজব করছে। দেখলাম অরটেগা হাত রেখেছে আমার গায়ে, আরেক হাতে বাড়িয়ে আছে অ্যাসপিরিনের বোতল।

'রামের সঙ্গে এর কিছুটা চালান করে দাও গলায়,' বলল অরটেগা, 'এই জিনিস খেলে আর দুঃস্বপ্ন দেখবে না।'

বিছানা ছেড়ে বালির ওপর কয়েক পা হাঁটলাম আমি। বড় কয়েকটা কাঁকড়া ছাড়া আর কিছু নেই সৈকতে। পরবর্তী দিনগুলোতেও কোন দানবের আবির্ভাব ঘটল না, ফলে দর্শনার্থীদের দল জাদুমন্ত্রের বলে উধাও হয়ে গেল।

তীরের কাছে চ্যাপ্টা বয়াগুলো আরও কয়েক দিন রাখা হলো, তারপর ওগুলো সরিয়ে নিয়ে একটা শেডের পেছনে ফেলে দেয়া হলো।

যেদিন আমি ফিশারি ত্যাগ করে রওয়ানা দিলাম,

অ্যান্টোনিয়ো হরনেজ আমার সঙ্গে কিছুটা পথ এলো। জেলেরা তখন ট্রাক ভর্তি করছিল বিভিন্ন জিনিসে। ওরা একটু পরেই হাভানা রওয়ানা হবে।

'আপনার ঠিকানাটা আমার কাছে রেখে যান,' আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদায় নেবার সময় বলল হরনেজ, 'এই রহস্যের কোন কিনারা করতে পারলে চিঠি লিখে জানাব।'

আজও আমি তার চিঠির অপেক্ষায় আছি।

নয়

গল্পগাঁথা আর নাটকীয় ঘটনায় ক্যারিবীয়ানের অন্য যেকোন দেশের তুলনায় ছোট্ট প্রজাতন্ত্র হাইতির ইতিহাস অনেক অনেক সমৃদ্ধ।

ষোলো শো সাতানব্বুই সালে রাইসউইক চুক্তির পর, ফ্রেঞ্চদের অধিকারে চলে গেল হাইতি। আঠারো শো শতকের শুরুতে ফ্রান্স থেকে যারা এই দ্বীপে এলো, তাদের বেশিরভাগই ছিল অভিজাত পরিবারের মানুষ; ট্রপিকে ভাগ্য পরীক্ষা করতে এসেছিল। তাদের আগমনে পরিষ্কার হয়ে যেতে লাগল জঙ্গল। তামাকের প্ল্যানটেশন দিল তারা, আফ্রিকা থেকে দলে দলে আমদানি করল কালো ক্রীতদাস।

দশ বছরে পাল্টে গেল হাইতির চেহারা। তখন অবশ্য দ্বীপটার নাম গ্রাঁ সেইনিয়র্স দ্য সান্তা ডোমিনিক। ভারসেইল্‌স্ শহরকে সৌন্দর্যের জন্যে তুলনা করা হতে লাগল মার্টিনিকের সঙ্গে।

তারপর ফ্রান্সে যখন বিপ্লব হলো, হাইতির বুকেও দোলা লাগল তার। ফ্রান্সে তখন আন্দোলন হচ্ছে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে। সেই সুযোগে জ্যামাইকার এক নিগ্রো ক্রীতদাস, বোকম্যান তার বিদ্রোহ পরিচালনা করল। বোকম্যান ছিল ছয় ফিট আট ইঞ্চি লম্বা এক প্রকাণ্ডদেহী দানব। তার অধীনে এক রাতে শ'খানেক নিগ্রো একত্র হলো। তাদের উত্তেজিত করে তুলল বোকম্যান। তারপর সকাল হতেই শুরু হলো পাইকারী হত্যাকাণ্ড। খামারগুলোয় ছড়িয়ে গেল নিগ্রোর দল, নির্বিচারে গলা কাটতে লাগল উপনিবেশকারীদের, পুড়িয়ে দিল তাদের বাড়ি-ঘর। এক সপ্তাহ ধরে চলল নিগ্রোদের হত্যাযজ্ঞ। কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মারা হলো ফ্রেঞ্চদের, উপড়ে নেয়া হলো তাদের চোখ, সেলাই করে গেঁথে দেয়া হলো একসঙ্গে দু'জনকে।

বাহামার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা কি ঘটছে আঁচ করতে পারলেও কোন সাহায্য তৎক্ষনাৎ করল না।

ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি সেনাবাহিনী পাঠাল বিদ্রোহ দমনের জন্যে, কিন্তু সেই সেনাবাহিনী যুদ্ধ করতে গিয়ে দ্বীপের উত্তর প্রান্তে কোণঠাসা হয়ে পড়ল। যুদ্ধে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলো তারা। নিগ্রোদের পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করল গায়ানার প্রাচীন রাজা গৌ-গুইনোর বংশধর টৌসেন্ট লোভারচার। পরবর্তীতে এই লোভারচারের অধীনে আরও কয়েকটা যুদ্ধে জেতে নিগ্রোরা।

সতেরো শো চুরানব্বুই সালে লোভারচার ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্সের গভর্নর বাধ্য হন উপনিবেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে। দ্বীপের দক্ষিণে মুলাটো আর বর্ণসংকরদের যে বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছিল, সেটাও কঠোর হাতে দমন করে লোভারচার। এরপর শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে পাশের স্প্যানিশ উপনিবেশ আক্রমণ করে সে, (এখনকার ডোমিনিকান রিপাবলিক) প্রচণ্ড যুদ্ধ শেষে জয় করে নেয় উপনিবেশের রাজধানী। স্প্যানিশ গভর্নর বাধ্য হন একটা কুশনে করে

ক্রীতদাসদের শেকলের চাবি তাকে উপহার দিতে। ডোমিনিকান রিপাবলিকের ক্রীতদাসরা এবার হয়ে গেল মুক্ত স্বাধীন মানুষ।

পরবর্তী সময়ে প্রমাণ হলো, শুধু যোদ্ধা হিসেবে নয়, শাসক হিসেবেও লোভারচার অত্যন্ত দক্ষ। বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করল সে, খামারগুলোয় সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনল, নির্ধারিত করল নির্দিষ্ট কর। অলসতার শাস্তি দেয়া হতে লাগল চাবুক মেরে, অবাধ্যতার শাস্তি–মৃত্যুদণ্ড!

তবে নীতিগত ভাবে এই উপনিবেশ এখনও রইল ফেঞ্চ রিপাবলিকের মধ্যে। ফ্রান্সের অপমান মেনে নিতে পারলেন না তৎকালীন শাসক নেপোলিয়ন। তাঁর বোন পওলিন বোনাপার্টের স্বামী লেকলার্কের অধীনে সত্তরটা জাহাজে করে পঁচিশ হাজার যোদ্ধা পাঠালেন তিনি। কয়েক দফা প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো নিগ্রোদের সঙ্গে লেকলার্কের, তারপর নিগ্রোরা বাধ্য হলো যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে।

যাত্রা শুরুর আগেই কি করতে হবে সে-বিষয়ে লেকলার্ককে গোপন নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন নেপোলিয়ন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী ফেঞ্চ জাহাজ বহরের একটা জাহাজে লোভারচারকে আমন্ত্রণ জানালেন লেকলার্ক। সে আসতেই তাকে বন্দি করা হলো।

এরপর লোভারচারকে ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে তাকে আটকে রাখা হলো জুরা পাহাড়শ্রেণীর কাছে একটা ছোট দুর্গে। চরম হতাশাগ্রস্ত লোভারচার সেখানে তার রাত পার করত নেপোলিয়নের কাছে চিঠি লিখে। বেশিরভাগ চিঠিই শুরু হতো এই কথা দিয়ে: 'কালোদের নেতার তরফ থেকে সাদাদের নেতার প্রতি...'

সম্রাট প্রতিউত্তর না দিয়ে নীরবতা পালন করতেন। কিন্তু এক দিন কারাপ্রধানের কাছে নির্দেশ গেল যাতে সে বন্দির কক্ষ থেকে কলম, কালি আর কাগজ সরিয়ে নেয়।

কারারুদ্ধ হওয়ার একবছর পর টৌসেন্ট লোভারচারকে এক সকালে মৃত পাওয়া গেল তার কক্ষে। আগুনের পাশে বসে ছিল সে, মাথাটা হেলে ছিল চিমনির গায়ে।

লোভারচারের মৃত্যুর পর ক্যারিবীয়ানে আবার ক্রীতদাস প্রথা চালু করা হলো। আরেকবার জ্বলে উঠল বিদ্রোহের আগুন।

এবার ফ্রান্সের সেনাবাহিনীকে শুধু নিগ্রোদের সঙ্গে লড়তে হলো তা-ই নয়, এবার যুদ্ধের চেয়ে তাদের ক্ষয়ক্ষতি বেশি হলো পীতজ্বরে। নানান ঝামেলায় তিতিবিরক্ত হয়ে গেল সেনাবাহিনীর অফিসাররা। তারপর যে গণহত্যা সংঘটিত হলো, তেমনটা ক্যারিবীয়ানের ইতিহাসে আগে আর কখনও ঘটেনি। আতঙ্কের রাজত্ব কায়েম করল ফ্রেঞ্চ সেনাবাহিনী। রোশ্যামব্যু নামের এক অতি সুদর্শন অফিসার নেতৃত্ব পেয়ে তার বিকৃত মানসিকতার চরম বহিপ্রকাশ ঘটাল। যদিও ফ্যাশন পাল্টে গিয়েছে, তবুও পাউডার মাখা একটা পরচুলা পরত লোকটা। তার আনন্দ লাভের অন্যতম একটা মাধ্যম ছিল নিগ্রো দেখলেই তার মাথা ভাঙা। লেকলার্ক দলে দলে নিগ্রোদের গুলি করে মেরেছে, ফাঁসিতে চড়িয়েছে; এই রোশ্যামব্যু লোকটা নিগ্রোদের মারতে লাগল পানিতে চুবিয়ে, কুকুর লেলিয়ে পাকড়াও শেষে গুলি করে এবং জাহাজের হোল্ডে আটকে গন্ধকে তাদের শ্বাস রোধ করে।

এত অত্যাচার করেও হাইতির বিদ্রোহ ঠেকাতে পারল না রোশ্যামব্যু। হাইতি স্বাধীনতা লাভ করল আঠারো শো চার সালের পহেলা জানুয়ারি।

দ্রুতই রচনা করা হলো সংবিধান। ডেসেলাইন্স নামের একজন প্রাক্তন ক্রীতদাস নিজেকে ঘোষণা করল সম্রাট হিসেবে। ক্ষমতায় যেয়ে জ্যাকুইস-এক নাম নিল সে।

পরবর্তী এক শো বছর হাইতির ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায় ক্ষমতা দখলের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একের পর এক ক্যু হলো, গৃহযুদ্ধ লেগেই থাকল; ফলে শাসকরা ক্ষমতায় বসতে পারল অতি

অল্প সময়ের জন্যে। ঘন ঘন চলতে লাগল প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। ফলাফল: বিশৃঙ্খলা আর রক্তপাত।

উনিশ শো পনেরো সালে গিলোম স্যাম ক্ষমতা দখল করল একটা গণবিপ্লবের মাধ্যমে। কিন্তু তার কপালেও হাইতি শাসন করা ছিল না। কদিন পরেই উন্মত্ত জনতার হাতে মৃত্যু ঘটল স্যামের। এবার হস্তক্ষেপ করল আমেরিকান মেরিনরা। তারাই এখনও হাইতিতে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত।

হরনেজের ফিশারি ছেড়ে চলে আসার এক সপ্তাহ পর হাভানা থেকে হাইতি যাবার আকাশযানে চেপে বসলাম আমি। সন্ধে নামার বেশ কিছুক্ষণ পর পোর্ট অ প্রিন্সের বিমানবন্দরে অবতরণ করল আকাশযান। এক ঘণ্টা লাগল সেখান থেকে শহরে পৌঁছুতে। যে-রাস্তাটা দিয়ে এলাম, সেটায় কোন বাঁক নেই, একেবারেই সোজা; দু'ধারে কেবিনের সারি, সেগুলোর মাথায় খড়ের ছাউনি। আজকের দিনটা ছিল অত্যন্ত তপ্ত। কেবিনের বাইরে মাথায় চওড়া স্ট্র হ্যাট চাপিয়ে খালি গায়ে শুয়ে আছে দলে দলে নিগ্রো, যেন একগাদা পরিত্যক্ত পাপেট। উজ্জ্বল রঙের টার্ব্যান পরনে বয়স্ক কয়েকজন নিগ্রেসকেও আমি পার হয়ে এলাম পথে। তাদের মুখে ছিল পাইপ, কষে টান দিয়ে সুখী চেহারায় ধোঁয়া ছাড়ছে; চলেছে গাধার পিঠে চেপে। পথের ধারে আরও দেখলাম ছোট ছোট জটলা। ওখানে গাছের নিচে তাস কিংবা ডাইস খেলা চলছে। খেলোয়াড়দের মনোযোগ অটুট, মাঝে মাঝেই চুমুক দিচ্ছে হাতে ধরা রামের গ্লাসে; গাড়ি বা ঘোড়ায় টানা ট্যাক্সি যে রাস্তায় ধুলোর ঝড় তুলে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ নেই। চাষীরা দল বেঁধে রাস্তার ধার দিয়ে গ্রামে ফিরে চলেছে, দিনের বেচাকেনা শেষে।

রাস্তায় চলছে ব্রিডল্‌স্, হার্নেস আর হার্নেস-বেল পরানো শত শত ঘোড়া। এছাড়া আছে গাধা আর খচ্চর। কখনও কখনও রাস্তা

দখল হয়ে যাচ্ছে। গাধা, ঘোড়া আর খচ্চরের পরিমাণ এতই বেশি যে প্রথম দর্শনে মনে হয়, গোটা দ্বীপটাই একটা মস্ত বড় মেরি-গো-রাউন্ড।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যে ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাকে নিয়ে চলেছে, একটা কাগজ উইন্ডস্ক্রীনের সামনে রেখে দিয়েছে সে। ওটাতে লেখা আছে হাইতিতে চেনা আমার একমাত্র লোকটির ঠিকানা: ফিলিপ জন্সফেয়ার, এক আমেরিকান, কয়েক মাস হলো পোর্ট অ প্রিন্সে বাস করছে সে।

বছরে একবার নিউ ইয়র্ক ছেড়ে দুনিয়ার অন্য কোথাও চলে যায় জন্সফেয়ার, সেখানে একটা বাড়ি ভাড়া নেয় কয়েক মাসের জন্যে। সঙ্গে থাকে একজন স্থানীয় চাকর আর ভাড়া করা একটা গাড়ি। অত্যন্ত বিলাসী জীবন যাপন করে সে। টাকার অভাব নেই, নিয়মিত নিউ ইয়র্কের সাপ্তাহিকীগুলোতে বিদেশের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ লেখা ছাপা হয় তার।

তাঞ্জিয়ারে আট বছর আগে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ওখানের বন্দরে কয়েক ফিট ব্যবধানে দুটো নৌকোয় বাস করতাম আমরা দু'জন। আমেরিকান সিগারেট কিভাবে ফ্রান্স আর ইতালিতে স্মাগলিং করা হয়, কিভাবে কঙ্গো আর তাঞ্জিয়ারে সোনা চোরাচালান হয় ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠাত ও আমেরিকান সাপ্তাহিকীতে। তারপর এক উল্লাসমুখর সন্ধে শেষে নৌকোয় একা ফিরতে গিয়ে বন্দরের সিঁড়ি থেকে পড়ে গেল জন্সফেয়ার, পা-টা গেল ভেঙে। আর তাঞ্জিয়ারে কাজ করতে পারবে না বুঝে একদিন ইউনাইটেড স্টেটসের জাহাজে চেপে বসল। সেই তাকে শেষ দেখেছি আমি।

জন্সফেয়ারের বাড়ির সামনে আমার ট্যাক্সি থামতেই গাড়িটাকে ঘিরে ধরল দশ-বারোজন লোক। এক বুড়ো নিগ্রো সামনে বাড়ল; হাতে তখনও জুতো, আমি আসার সময় সেলাই করছিল। রাস্তার উল্টোপাশের মুচির দোকানটা তার। ভারিক্কি

ভাবভঙ্গি, আর কাউকে কথা বলতে দিল না, জানাল জন্সফেয়ার গেছে মোরগের লড়াই দেখতে। কথা শেষ হতেই একটা কয়েন পারিশ্রমিক পাবার আশায় হাত সামনে বাড়াল লোকটা। হাত বাড়ানোটা যেন ইঙ্গিত ছিল, তার দেখাদেখি এগিয়ে এলো আরও ছয়-সাতজন; প্রত্যেকেই সামনে বাড়িয়ে রেখেছে তাদের হাত, দু'চোখ জ্বলজ্বল করছে প্রাপ্তির আশায়।

'সাদা মানুষ, সাদা মানুষ, আমাকে একটা গর্ডি দাও!'

'আমাকে পাঁচটা সেন্ট, বস্!'

লোকগুলোর মধ্যে দু'জনের পরনে রীতিমতো ভাল পোশাক। তারাও গলা ফাটিয়ে ভিখ মাঙছে বাকিদের মতো। আমি বেশ অবাক হলাম। তবে দু'একদিন ঘোরাফেরা করেই আমার অবাক হওয়াটা কেটে গেল। হাইতির লোক যেমন সহজ সরল, তেমনিই ভিক্ষা করার প্রবৃত্তিও তাদের মজ্জাগত। প্রায় সবাই সুযোগ পেলে ভিক্ষা করে। এমনকি ছোট দোকানদাররাও বিন্দু মাত্র দ্বিধা না করে দোকান ফেলে ছুটে আসে এক গর্ডি ভিক্ষা নিতে। (এক গর্ডির মূল্য আমেরিকান বিশ সেন্টের সমান। আমাদের দেশের পাঁচ টাকার সমমূল্যের।)

সাহায্যকারীর দল আমাকে ঘিরে নিয়ে এলো শ্যাম্প-দ্য-মার্সে। ওখানেই নাকি মোরগের লড়াই হচ্ছে।

এই বিরাট চত্বর, শ্যাম্প-দ্য-মার্সই হচ্ছে হাইতিবাসীদের প্রাণকেন্দ্র। শোভিত হয়ে আছে ফুল, মূর্তি, গাছ আর ব্যান্ডস্ট্যান্ডে। এখানে রাজনীতির আলোচনা থেকে শুরু করে বক্তৃতা, বিচার সবই হয়েছে সময় সময়। বিপ্লবের সময় প্রথম গিলোটিন এখানেই তৈরি করা হয়। (বলা হয় শাস্তি প্রাপ্ত লোকটা ছিল রাজার শাসনের অনুরাগী হওয়ার ঘোরতর দোষে দোষী। লোকটার মৃত্যু দেখতে অসংখ্য মানুষের আগমন হয়েছিল। কিন্তু যেই মাত্র ইস্পাতের ফলা দোষীর মস্তক ছিন্ন করল, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল জনতা, রুদ্ররোষে চুরমার করে দিল যন্ত্রটাকে। সেদিন থেকে এদেশে আর

কখনও গিলোটিন ব্যবহার করা হয়নি।) প্রতিদিন অসংখ্য লোক আসে এখানে। ধীরে ধীরে হাঁটে তারা, কালো মুখ আর মাথায় চাপানো মস্ত হ্যাট দেখলে ফ্রান্স থেকে নতুন আসা কেউ ভেবে বসতে পারে যে ফ্রান্সেরই কোন উপনিবেশে এসেছে। আড্ডা মারতে আসা লোকগুলো প্রতি পনেরো কদম পর পর একবার করে থামে, তারপর আবার এগোয়; উদ্ভট ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়ে কথার যৌক্তিকতা বোঝাতে গিয়ে।

পোর্ট অ প্রিন্সের নিগ্রোদের বিনোদনগুলোর অন্যতম হচ্ছে মোরগ-লড়াই। প্রতিদ্বন্দ্বী যাতে সহজে লড়াইয়ে না জেতে সেজন্যে মোরগগুলোর চাঁদি ছিলে দেয়া হয়। বৃত্তাকার একটা রুক্ষ জমিতে শত্রুর জান কবচ করে বিজয়ী মোরগ। প্রতিটা লড়াই দেখতে জড় হয় দেড় থেকে দু'শো নিগ্রো। তাদের চেহারা থাকে মোহাবিষ্ট, যেন সেন্ট ভিটাসের নাচ দেখছে বা ভুডুর প্রভাবে বিবশ হয়ে গেছে। অবিশ্বাস্য বড় অংকের টাকা বাজি ধরা হয়। ছেঁড়াখোড়া পোশাক পরা নিগ্রোরা পকেট থেকে বের করে গর্ডি আর ডলারের বান্ডিল। লড়াইতে নামানোর আগে হাতে হাতে ঘোরে মোরগ দুটো; ওগুলোর পালক গুছিয়ে দেয়া হয়, পেননাইফ দিয়ে ধারাল করে দেয়া হয় নখরগুলো।

মোরগ-লড়াইতে জন্সফেয়ারের খোঁজ পাওয়া আশ্চর্যের কোন বিষয় নয়; বাজি ধরার সুযোগ পেলে জন্সফেয়ার সবকিছুতেই রাজি। তাঞ্জিয়ারে ও বাজি ধরত বন্দরে নৌকোর সংখ্যা নিয়ে। আবার কখনও পকেট থেকে ডলার বের করে বন্ধুর নাকের নিচে গুঁজে দিত ও, বলতে হতো নোটের সিরিয়াল নাম্বার জোড় না বিজোড়। অভিনব সব ব্যাপারে বাজি ধরার ব্যাপারে ওর জুড়ি নেই। ওয়েইস্ট কোটের পকেটে জন্সফেয়ার সবসময় একটা ডাইস রাখে, জ্যাকেটের পকেটে থাকে এক প্যাকেট তাস।

জন্সফেয়ার মাত্র তিন গজ দূরে, এমন সময় ওকে দেখতে পেলাম আমি; কিন্তু আমাকে ও দেখতে পেল না শেষ মোরগ-

লড়াইটা শেষ হওয়ার আগে। একবারও এদিক ওদিক তাকায়নি ও।

এক ঘণ্টা পর, শ্যাম্প দ্য মার্সের কাছে হাঁটছি আমরা, হাঙরের কথা তুললাম আমি। হাত নেড়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল জন্সফেয়ার। ও জানে না এখানে মাছ ধরা হয় কি হয় না, তবে একজন মিশনারিকে চেনে যে অবশ্যই জানবে। ভদ্রলোকের অজানা কিছুই নাকি নেই। ফাদার ল্যার্টিগ তাঁর নাম।

ছোটখাট হালকা পাতলা মিশনারির বয়স হবে ষাটের কাছাকাছি। মুখে চিকন চাপ দাড়ি। পরদিন জন্সফেয়ারের সঙ্গে আমি দুপুরের খাবার সেরে উঠব ভাবছি, এমন সময় তিনি এলেন।

আমি হাঙর শিকারে আগ্রহী শুনে তিনি বললেন রাজধানী থেকে ষাট মাইল দূরে একটা জেলে-গ্রাম আছে, সেখানে আমার অবশ্যই যাওয়া উচিত। জন্সফেয়ার কখনও হাঙর শিকার করেনি; বলল ও-ও চেষ্টা করে দেখবে হাঙর মারতে পারে কিনা। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম দু'দিন পর রওয়ানা হব। ফাদার ল্যার্টিগও ওদিকেই যাবেন। ঠিক হলো যাওয়ার পথে তাঁকে আমরা তাঁর মিশনে নামিয়ে দেব।

দশ

হাইতিয়ানদের প্রাচীন একটা কুসংস্কার আছে: রাতে কবর ছেড়ে উঠে আসে জিন্দা লাশ, হেঁটে বেড়ায় গ্রামাঞ্চলে। দ্বীপের এখানে

ওখানে এখনও পাওয়া যায় নিগ্রো বুড়োদের, যারা নিজের মাথার তো বটেই, সন্তানসন্ততি এবং পরিবারের মাথার কসম দিয়েও বলবে, ঝোপের মাঝ দিয়ে জোমবিদের হাঁটতে দেখেছে তারা।

'ওরা বিপজ্জনক নয়,' বলে নিগ্রো বুড়োরা। 'তোমার দিকে প্রাণহীন নিষ্পলক ঘোলা চোখে তাকাবে ওরা, কিন্তু দেখবে না কোন কিছুই। পাশ দিয়ে হেঁটে পার হয়ে যাবে, যেন তুমি নেই ওখানে। আসলে ওরা কবরে শুয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত, পায়ের ব্যায়াম করতে ওপরে উঠে আসে।'

দেখতে দেখতে দু'দিন পার হয়ে গেল, সবুজ গাছে ভরা গোল টিলাগুলোর মাঝ দিয়ে পথ করে পোর্ট অ' প্রিন্স ছাড়লাম আমরা। দ্রুত ছুটছে জন্সফেয়ারের ভাড়া করা গাড়িটা। বাইরে তাকালাম। চমৎকার ঘন নীল আকাশ, বাতাস বইছে মৃদুমন্দ, চারপাশে অদ্ভুত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। রাস্তার দু'ধারে ক্লিমেটিস আর নীল কলামবাইন ফুল ফুটেছে। মাঝে মাঝেই স্যাঁৎ করে পেছনে চলে যাচ্ছে ছোট ছোট পুকুর আর সাজানো গোছানো বাগান। মনোযোগ সরিয়ে জোমবির কিংবদন্তী জানতে ফাদার ল্যার্টিগের দিকে ফিরলাম আমি।

তিনি বসে আছেন গাড়ির পেছনের সীটে, ব্যস্ত হয়ে পেননাইফ দিয়ে হাতের লাঠিটা চেঁছে সুন্দর করছেন। এব্যাপারে তাঁর ধৈর্য প্রায় চাইনিজদের মতো। দু'হাতের তালুতে ঘষে হাতির দাঁতের তৈরি গোলক কয়েক পুরুষ ধরে মসৃণ করে চাইনিজরা।

আমি কথা শেষ করার খানিক পর হাতের কাজ থেকে মুখ তুলে তাকালেন ফাদার ল্যার্টিগ। বললেন, 'শুনলে বলতে পারি আশ্চর্য একটা ঘটনা।' আমি উদগ্রীব দেখে হাসলেন তিনি। শুরু করলেন: 'অনেক অনেক বছর আগে, কতদিন তা নিশ্চিত হয়ে কেউ বলতে পারে না, এদেশে বাস করত ওষুধ তৈরিতে অতি দক্ষ যাদুকরের দল। লতাগুল্ম দিয়ে মানুষের স্নায়ুতন্ত্রী অবশ করে দেয়ার মতো পানীয় তৈরি করতে পারত তারা। যাকে সেই পানীয়

পান করানো হতো, সে হয়ে যেত অনেকটা রোবটের মতো। তখন তাকে দিয়ে করানো যেত বুদ্ধির প্রয়োজন নেই এমন যেকোন কাজ। সারাদিন কাঠ ফাঁড়তে পারত তারা, ফসলের কাজ করে যেতে পারত কোন বিশ্রাম ছাড়াই; কিন্তু নিজে থেকে কোন উদ্যোগ নেয়ার সামর্থ্য ছিল না বেচারাদের। ওষুধ খাওয়ানোর সুবিধেটা হলো, তাদের দিয়ে বিনে পয়সায় পরিশ্রমের কাজ করিয়ে নেয়া যেত, প্রতিবাদ আসার সম্ভাবনা নেই। বিনিময়ে খাবার অতি সামান্য দিলেই চলত। তবে ওষুধ নামের এই বিষের প্রতিক্রিয়া চিরস্থায়ী। বছর বিশেক আগে এক ইংরেজ বিজ্ঞানী এই বিষয়ে তাঁর গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। একই সময়ে ঘটে একটা দুঃখজনক ঘটনা। ভাল পরিবারের এক তরুণী মেয়ে রহস্যজনক ভাবে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায় পোর্ট অ প্রিন্স থেকে। তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল, নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পাহাড়ের গভীরে। ওখানে মেয়েটিকে ওই বিষ খাইয়ে দেয়া হয়। কয়েক বছর পরে তাকে খুঁজেও পাওয়া যায়। সেই সময়ে যতরকম চিকিৎসা ছিল সবই করা হয়, কিন্তু কখনোই আর মেয়েটির জ্ঞান পুরোপুরি ফিরে আসেনি।'

ফাদার ল্যার্টিগকে মিশনে নামিয়ে দিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। এক ঘণ্টা পর একটা টিলার মাথায় উঠে দেখতে পেলাম আদিগন্ত নীল সমুদ্রের বিস্তৃতি। সামনে এঁকে বেঁকে সৈকতের দিকে নেমে গেছে একটা সরু মেঠো পথ। দূরে দেখা যাচ্ছে খড়ের ছাউনি দেয়া কুঁড়ের সারি। সৈকতের ডান ধার দিয়ে এগিয়ে গেছে মেঠো পথটা।

ওদিকে তাকালে দেখা যায় ছোট্ট একটা প্রাকৃতিক বন্দর। বড় একটা অর্ধচন্দ্রাকার পাথর সমুদ্রের দিকে বেড়ে আছে, ওটাই জেটি। আরও একশো গজ দূরে দেখা যাচ্ছে একগজ চওড়া একটা খাল। ওই খাল দিয়ে একটা অগভীর লেগুনে প্রবেশ করেছে

সাগরের পানি। লেগুনের পাড়ে আরও গোটা দশেক কুঁড়ে দেখতে পেলাম।

বন্দরে নোঙর করে আছে ছয়টা নৌকো, তিনটাকে তুলে রাখা হয়েছে সৈকতের ওপর। দেখলাম সৈকতে দৌড়াদৌড়ি করছে স্ট্র হ্যাট মাথায় দুটো বাচ্চা। হ্যাট ছাড়া আর কিছুই নেই তাদের গায়ে। মাথার ওপরে নীল আকাশ, নিচে যেন তারই প্রতিবিম্ব–নিথর নিস্তরঙ্গ, ছবির মতো সাগর। চারপাশে সবুজের ছড়াছড়ি, লালচে মাটিতে নানা প্রজাতির অসংখ্য গাছের সমাহার, তার মধ্যে জীবন্ত প্রাণী বলতে সৈকতে খেলা করা ওই বাচ্চাগুলো, এছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না।

গ্রামের শেষ প্রান্তে গাড়ি রেখে দুই সারি কুঁড়ের মাঝখানের পথটা ধরে বন্দরের দিকে হেঁটে এগোলাম আমরা। তিন নিগ্রো শুয়ে আছে একটা নৌকোর ছায়ায়। জন্সফেয়ার আমার আগেই তাদের কাছে পৌঁছে গেল, কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগল সে কি চায়। কয়েক দিনের জন্যে একটা কুঁড়ে ঘর ভাড়া চাই আমরা, সঙ্গে পর্যাপ্ত খাবার।

ভাড়া দেয়ার মতো কোন কুঁড়ে নেই, কিন্তু জন্সফেয়ার চেপে ধরতে ওরা জানাল ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ছোট একটা পরিবার তাদের বাসস্থান ছেড়ে দেবে আমাদের জন্যে। বাড়িটা কাঠ দিয়ে তৈরি। ফাঁকফোঁকর বন্ধ করা হয়েছে সিমেন্ট দিয়ে। মাথার ওপর খড়ের ছাদ। তাতে আটকে রাখা হয়েছে পুরনো এক টুকরো লিনোলিয়াম। ঘরের ভেতরে, মাটিতে দুটো বিছানা পাতা আছে। এক কোণে আছে একটা কেরোসিনের চুলো। দেয়ালে সাঁটা আছে অনেকগুলো ছবি। ওগুলো সুইস সাপ্তাহিকী গুয়েইজার ইলাস্ট্রিয়ার্টি থেকে কেটে নেয়া। কি করে ওই পত্রিকা এখানে এসে ঠাঁই পেয়েছে সেটা রীতিমতো রহস্যময়।

সঙ্গে জিনিসপত্র আমরা খুব কমই এনেছি, সেগুলো বয়ে ঘরে নিয়ে এলো জন্সফেয়ার। মালামালের মধ্যে আছে একটা বড়-মাছ

ধরার উপযোগী ছিপ; আর দুটো কারবাইন। বাইরে গেলে কারবাইন দুটো সব সময় জন্সফেয়ারের গাড়ির বুটে থাকে।

সব গুছিয়ে বন্দরে গেলাম আমরা। ততক্ষণে ডুবে গেছে সূর্য, আকাশ কালো করে রাত নেমেছে, একে একে যার যার কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে আসছে নিগ্রো জেলেরা, যেন নিশাচর বাদুড়, শিকারে বেরিয়েছে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গল্প করতে করতে অলস ভঙ্গিতে এলো ওরা, আমাদের সঙ্গে এসে হাত মেলাল।

খবর ছড়িয়ে গেছে গ্রামে, কাজেই ওরা জানে যে হাঙর শিকার করতে ওদের গ্রামে এসেছি আমরা; থাকব কয়েক দিন। অবাক চোখে আমাদের দেখল নিগ্রোরা। সাগরে হাঙরের কোন অভাব নেই, কিন্তু বাধ্য না হলে কেউ হাঙর ধরে না। তবে একজন আছে, বছর ষাটেক বয়সের এক নিগ্রো মুলাটো, নাম ফেলিশিয়েন; প্রতিদিন হাঙর শিকার করে সে, তীরে নিয়ে আসে দু'তিনটে করে। নিজেই কাটে হাঙর। মাসে দু'বার হাঙরের তেল আর চামড়া বেচতে তাকে যেতে হয় পোর্ট অ প্রিন্সে। অন্যান্য জেলেরা সাধারণ মাছ ধরেই জীবিকা নির্বাহ করে। পাহাড়ী গ্রামগুলোতে মাছ বেচে রোজগার করে তারা।

বন্দরের এক কোণে একটা ছাউনি আছে। সেটার নিচে আছে একটা বেঞ্চি আর কাঠের লম্বা কাউন্টার। ওটাই গ্রামের ক্যাফে; খাবার আর পানীয় পাওয়া যায়। এক বুড়ি নিগ্রো মহিলা দু'বোতল রাম দিয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে জমিয়ে বসল দশ-বারোজন নিগ্রো জেলে। রাম পানের ফাঁকে ফাঁকে চলতে লাগল আলাপ।

কিছুক্ষণ পর এলো ফেলিশিয়েন ওবিন।

লেগুনের তীরে যে দশটা কুঁড়ে আছে, সেগুলোরই একটাতে বাস করে ফেলিশিয়েন। ও বলল ওর নৌকোটা গ্রামের বড় নৌকোগুলোর একটা, তবুও ওটা হাঙর শিকারের তুলনায় বেশি ছোট। সেজন্যে নৌকোয় বাড়তি ওজন চাপায় ফেলিশিয়েন, যাতে

সহজে নৌকো টেনে নিয়ে যেতে না পারে হাঙর। শুধু রাতেই শিকার করে ফেলিশিয়েন, তা-ও সপ্তাহে মাত্র তিন-চার বার। কাজেই বলা মাত্র ওর নৌকোটা আমাদের কাছে ভাড়া দিতে রাজি হয়ে গেল। কালকে থেকে ভাড়া দেবে, তবে শর্ত আছে একটা: সঙ্গে ওকেও নিতে হবে।

এই গ্রামের অন্য জেলেরা মোটামুটি ফ্রেঞ্চ বলতে পারে, কিন্তু ফেলিশিয়েন যেটা বলে, সেটা ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি আর আঞ্চলিক ভাষার এক দুর্বোধ্য মিশ্রণ। সুরেলা গলায় লম্বা লম্বা বাক্য বলে ও। একই কথা ওর কয়েক বার করে বলতে হয়, নাহলে ও কি বলছে তা আমরা বুঝে উঠতে পারি না।

পরদিন বন্দর ছাড়ার পর থেকেই টোপের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলাম আমি। নৌকো থেকে বিশ গজ পেছনে দড়িতে বাঁধা রয়েছে টোপটা। আমি আশা করছি না যে ছিপে হাঙর ধরা পড়বে, আমি শুধু চাইছি জন্সফেয়ারকে দেখাতে যে কিভাবে ওর নতুন কেনা ছিপটা ব্যবহার করতে হবে; এমন সময়ে প্রচণ্ড জোরে দিনের প্রথম এবং শেষ ঠোকরটা দিল একটা মাছ। আরেকটু হলেই আমার হাত থেকে সাগরে গিয়ে পড়ত জন্সফেয়ারের ছিপ। কোনমতে ওটাকে ধরে রাখলাম আমি। এক্সপ্রেস ট্রেইনের গতিতে হুইল থেকে বেরিয়ে ছুটল সুতো। অপেক্ষা করলাম, তারপর যেই সুতোয় একটু ঢিল পড়ল, অমনি ছিপে ঝটকা মারলাম। তিন সেকেন্ড পর আবার সুতো যেতে লাগল। আগের চেয়ে আস্তে যাচ্ছে, কিন্তু যাওয়া ঠেকাতে পারছি না। আজকে কপাল নিয়ে ঘুম থেকে উঠেছে জন্সফেয়ার। মস্ত একটা হাঁ করে বড় বড় চোখে বিস্মিত চেহারায় সুতোর দিকে তাকিয়ে থাকল; হাত থেকে পড়ে গেল কারবাইন। বড় মাছ দেখলে গুলি করে মারবে বলে নৌকোয় ওঠার সময় কারবাইনটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ও। নৌকোর হাল ধরে বসে আছে ফেলিশিয়েন। ধীরে ধীরে সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। বলল, 'আমি জানি। বড়, বিরাট বড় টিবুরোঁ। সুতো

ছিঁড়ে নিয়ে যাবে।'

সুতো গোটাতে চেষ্টা করলাম আমি। ফেলিশিয়েন এমন ভাবে নৌকো পাশ ফেরাল যাতে সুতো টানতে দানবটার কষ্ট বেশি হয়। আমি ভাবলাম: কি মাছ এটা? আগে তো কোন মাছকে এত জোরে সুতো টেনে নিয়ে যেতে দেখিনি!

এক ঘণ্টা পর। এখনও মাছটা সমানে বাধা দিচ্ছে। কিছুতেই কাছে আসছে না, রয়ে গেছে কয়েক শো গজ দূরে। হাত দুটো ধরে গেছে আমার। ছিপটা ওবিনের হাতে দিয়ে দিলাম। ততক্ষণে ভাবতে লেগেছি, কোন তিমির গায়ে বড়শি বিঁধিয়ে বসিনি তো আমরা?

সকাল এগারোটা বেজে গেল। এখনও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি। এরমধ্যে কয়েকবার করে ছিপ সামলেছি আমরা। প্রত্যেকেই কয়েক গজ করে সুতো টেনে এনেছি, তারপর চোখের সামনে দেখেছি আবার সুতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে মাছটা। কিছুক্ষণ হলো আমাদের চারপাশে বেশ কয়েকটা নৌকো জড় হয়ে গেছে। কয়েকটা নৌকো বন্দরের দিকে চলে গেল। একটু পরেই আবার ফিরে এলো ওগুলো। মজা দেখানোর জন্যে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে বুড়ো, বাচ্চা আর মহিলাদের। তাদের সঙ্গে দুটো কুকুরও আছে। ছেলে-বুড়ো সবাই মিলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে আর হাততালি দিচ্ছে, উৎসাহিত করছে আমাদের।

দুপুরে ক্লান্ত প্রাণীটাকে আমরা নৌকোর পাশে নিয়ে আসতে পারলাম। আশেপাশের নৌকোগুলো কাছে চলে এলো। হঠাৎ চুপ হয়ে গেল সবাই। থমথম করতে লাগল চারদিক। তারপর অদম্য হাসিতে ফেটে পড়ল জেলেরা।

একটা টিউনা ধরেছি আমরা। বড় জোর তিন ফিট হবে টিউনাটা। বড়শি ওটার মুখে বেঁধার বদলে বিঁধেছে গায়ের চামড়ায়, ফলে দুর্বল হতে অনেক সময় নিয়েছে মাছটা। তারপর শেষ পর্যন্ত হয়তো ছুটেই যেত, কিন্তু ঝামেলা বাধাল সুতো। কোন

এক দুর্ভাগ্যজনক মুহূর্তে ওটা জড়িয়ে গেল টিউনার লেজে। পাক্কা তিন গজ সুতো পেলাম আমরা ওটার লেজে।

পরবর্তী এক সপ্তাহ টিউনা আর আমরা হয়ে থাকলাম গ্রামবাসীদের আলোচনার মূল বিষয় বস্তু। টিউনাটা বছরের এই সময়ে তীরের এত কাছে পাওয়া যাবার কথা না। আর আমরা হচ্ছি সেই সব সাদা মানুষ, যারা লেজে সুতো বাধিয়ে মাছ ধরে। তবে হাসির পাত্র হতে হলেও এই ঘটনায় আমরা একটা পরিচিতি লাভ করলাম। দূর দূরান্তের পাহাড়ে যেসব মাছ বিক্রেতা যায়, তারা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিল আমাদের কাহিনী।

পরের কয়েকটা দিন আমি একাই বুড়ো ফেলিশিয়েন ওবিনের সঙ্গে সাগরে মাছ ধরতে গেলাম। জন্সফেয়ার গেল সমুদ্র তীরবর্তী গ্রামগুলো ঘুরে দেখতে।

কুঁড়ের সামনে লম্বা একটা কাঠের পাটাতন রেখেছে ওবিন। পাটাতনটা পানির ওপর এক গজ বেড়ে আছে। হাঙর ধরে আনার পর ওখানেই চামড়া ছাড়ায় ওবিন, সাগরের পানিতে ভাল মতো চামড়া ধুয়ে শুকাতে দেয়। এরপর শুরু হয় হাঙরের পাকস্থলীর তেল বের করার জটিল পদ্ধতি। প্রথমে পাকস্থলীটা টুকরো টুকরো করে হাঁড়িতে ভরে চাপিয়ে দেয় চুলোর ওপর। তারপর টুকরোগুলোর ওপর পানি ঢালে। নাড়তে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

এক সময় পাকস্থলীর শক্ত অংশ হাঁড়ির তলায় চলে যায়, ওপরে উঠে আসে তেল। সেই তেল তুলে নিয়ে ছাঁকনিতে ছেঁকে *কেগে ভরে। মাঝারী আকৃতির একটা হাঙর থেকে প্রায় চার গ্যালন তেল পাওয়া যায়। (ট্যানিং, স্টীল টেম্পারিং, ফার্মাসিউটিকাল কাজে এবং পাতলা তেল দরকার এমন যেকোন কাজে হাঙরের তেল ব্যবহৃত হয়।)

---

* কেগ হচ্ছে ছোট পিপে। ব্রিটিশ দশ গ্যালন বা আমেরিকান তিরিশ গ্যালন তরল আঁটে একটা কেগে।

হাঙরের পাখনা সাবধানে কেটে নেয় ওবিন। পোর্ট অ প্রিন্সের চাইনিজদের কাছে ওগুলো বিক্রি করে।

প্রতিদিন হাঙরের মাংস খায় ওবিন। খাওয়ার পরও রয়ে যায় প্রচুর। সেরকা বা সাগরের নোনা জলে ভিজিয়ে কড মাছের মাংস যেমন বিক্রি করা হয়, ঠিক তেমনি করে পাহাড়ী গ্রামগুলোতে বিক্রি হয় ওই মাংস। আর যেটুকু মাংস বিক্রি করা সম্ভব হয় না সেটুকু মুরগির খাবার হিসেবে ব্যবহার করে সে, অথবা তৈরি করে সার।

'হাঙরের সবই ভাল,' বলে ওবিন, 'শুধু কামড়টা ছাড়া।'

একদিন অসাধারণ একটা শিকার নিয়ে ফিরল সে। একটা টাইগার শার্ক। দশ ফিটের বেশিই হবে লম্বায়। লেজের কাছে একটা তাজা ক্ষত-চিহ্ন। কয়েক মিনিট পর হাঙরটা কাটতে গিয়ে বিস্ময়ে মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আওয়াজ করল ওবিন। হাঙরের গায়ে ক্ষতটা তৈরি হয়েছে তলোয়ার মাছের আক্রমণে। তলোয়ারটার আট ইঞ্চি একটা টুকরো ভেঙে রয়ে গেছে হাঙরটার দেহে। তলোয়ার মাছটা আর বাঁচবে না। শিকারকে মারতে তলোয়ার ব্যবহার করে সোর্ড ফিশ। ওটা ছাড়া মাছটাকে না খেয়ে মরতে হবে।

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে কিছুক্ষণ তলোয়ারটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওবিন, তারপর বিড়বিড় করে সুরেলা গলায় যা বলল তার থেকে আমি বুঝলাম যে হাঙরের আসল শত্রু সোর্ড ফিশ নয়, বরং বেলুন-ফিশ (ডিয়োডন অ্যান্টেন্যাটাস)। বেলুন-ফিশের আকৃতি মানুষের হাতের মুঠোর চেয়ে সামান্যই বড়, কিন্তু এরা হাঙরকে মারে বিভৎস ভাবে।

রেগে গেলে পটকা মাছের মতো শরীর ফোলাতে পারে ডিয়োডন। পেট ভরে টেনে নেয় পানি আর বাতাস। একই সঙ্গে ওটার মুখ দিয়ে বের হয় তীব্র অ্যাসিড। কোন হাঙর যদি ভুলেও বেলুন-ফিশ খেয়ে ফেলে তাহলে তার মৃত্যু নিশ্চিত। ফুলে ওঠে

ডিয়োডন, মুখ দিয়ে অ্যাসিড ছিটাতে থাকে। পুড়ে যায় হাঙরের পেটের ভেতরটা। বেলুন-ফিশ তখন তার গায়ের তীক্ষ্ণ কাঁটাগুলো দাঁড় করিয়ে সেগুলোর খোঁচায় হাঙরের পাকস্থলী আর দেহ ছিদ্র করে বাইরে বেরিয়ে আসে। মুহূর্তে টর্পেডোর আঘাত লাগা জাহাজের মতো তলিয়ে যায় হতভাগ্য হাঙর।

মাছ ধরা শেষে কুঁড়ের কাছে নিয়ে আসে বুড়ো ফেলিশিয়েন ওবিন, সেখানে মাছ কাটাকাটির পর লেগুনের পাড়ে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, জ্বালে একটার পর একটা সরু সিগার। নিজেই সিগার বানায় ও, তামাকের চাষ করে কুঁড়ের পেছনের এক ফালি জমিতে।

রাত নামলে জন্সফেয়ার আর আমি মাঝে মাঝে ওবিনের ওখানে গল্প করতে যাই। সেখানে রাম আর কফি দিয়ে আপ্যায়িত করা হয় আমাদের। ওর ভয়ানক সিগারও সাধে ওবিন, কিন্তু একবার খেয়েই শিক্ষা হয়ে যাওয়ায় আমরা আর ভুলেও সিগার নিই না। এক বিকেলে ওকে আমি শিখিয়ে দিলাম কি করে ফ্লাইং ফিশ ধরতে হয়। আমি শিখেছিলাম সেনর হর্নেজের কাছ থেকে। সেদিন ফিরতি পথে টের পেলাম, আমাদের প্রতি অনেক বেশি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে ওবিন। কিন্তু এই সখ্য টিকল মাত্র তিনটি দিন, কারণ তিন দিনের দিন আমাদের ও দেখে ফেলল পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে হাঙরদের গুলি করতে।

বুদ্ধিটা ছিল জন্সফেয়ারের। তার আগের দিন জেটির পাশ দিয়ে হাঁটছি, দেখতে পেলাম দুটো হাঙর তীরের দু'গজের মধ্যে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। এমন হবারই কথা, কারণ গ্রামের সব বর্জ্য ওখানেই ফেলা হয়। পর দিন দুটো কাঠের বাক্সে মাংস রেখে পানিতে নামিয়ে দিলাম আমরা। বাক্সের সঙ্গে দড়ি বেঁধে রাখলাম, যাতে পরে টেনে তুলতে পারি। এবার হাতে তুলে নিলাম কারবাইন।

জন্সফেয়ারের মাথায় এই বুদ্ধি আসার পেছনে একটা কারণই

আছে। এবার জানা গেল সেটা: 'যে আগে হাঙর মারতে পারবে দশ ডলার তার।'

সারাদিন অপেক্ষা করলাম আমরা, একটা হাঙরও চোখে পড়ল না। অথচ টোপ দিয়েছি অত্যন্ত লোভনীয়। বাক্সে রাখা মাংস থেকে রক্তের ধারা বের হচ্ছে, ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে নীল পানির সঙ্গে।

তারপর সন্ধে নামতেই এক সঙ্গে এসে হাজির হলো চারটা হাঙর। একটার গায়ে গুলি লাগাতে পারলাম আমরা। আহত হাঙরটা ঘুরে ঘুরে একই জায়গায় সাঁতার কাটতে লাগল, ওটার লেজের বাড়িতে ছিটকে উঠল সাগরের পানি। দু'জনই যেহেতু প্রায় একই সময়ে গুলি করেছি তাই বাজি কে জিতল সেটা নিশ্চিত হওয়া গেল না। এরপরের ঘটনা এতই অবাক করা যে এমনকি জন্সফেয়ার পর্যন্ত গুলি করতে ভুলে গেল।

অন্য হাঙরগুলো যেন টোপের কথা ভুলেই গেল। মারাত্মক আহত সঙ্গীকে ঘিরে ধরল ওরা। সব কয়টা ভাসতে লাগল নিশ্চল হয়ে। পরবর্তী কয়েক সেকেন্ড যেন অন্তর থেকে অনুভব করলাম আমরা হাঙরগুলোর মনের কথা। আহত হাঙরটা অন্যগুলোর তুলনায় দ্বিগুণ বড়। অপেক্ষা করছে ওরা। উপযুক্ত সময় এলে, নিজেদের নিরাপদ মনে করলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে সবাই আহত সঙ্গীর ওপরে। বড় হাঙরটার ঘোরা বন্ধ হয়ে গেল, বার বার কেঁপে উঠতে লাগল শরীর। ধূসর ধোঁয়া তৈরি হলো পানির নিচে। (সমতলের নিচে পানির সঙ্গে রক্ত মিশলে ধূসর দেখায়।) মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তলিয়ে গেল হাঙরটা। অন্যগুলোও ওটাকে অনুসরণ করে অদৃশ্য হলো। বাকি ঘটনা ঘটল পানির নিচে, আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। শুধু দেখলাম ফেনা তৈরি হচ্ছে পানির আলোড়নে, সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে উঠে আসছে বড় বড় রক্তলাল বুদ্বুদ।

আমরা কারবাইনগুলো রিলোড করছি, এমন সময় গুলির

আওয়াজ পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো ওবিন। বাক্সগুলো দেখেই কি ঘটেছে তা বুঝে ফেলল। আকাশের দিকে হাত তুলে দুর্বোধ্য স্প্যানিশে কি যেন বলতে লাগল বিড়বিড় করে। তারপর চুপ হয়ে গেল। চেহারায় ফুটে উঠল গভীর দুঃখ। আমাদের বুঝতে বাকি রইল না যে আসলে ওর মুখ থেকে রুটি ছিনিয়ে নিচ্ছি আমরা।

এই ঘটনার কয়েক সকাল পরে লেগুনের তীরে ফেলিশিয়েন ওবিনকে একদল জটলারত জেলের মধ্যে দেখতে পেলাম আমি। উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে প্রত্যেকে। তাদের মধ্যে এক লম্বা নিগ্রো আছে; সে-ই জটলার মধ্যবিন্দু। গ্রামে তাকে আগে কখনও দেখিনি। খালি গা তার। নীল একটা জিন্সের প্যান্ট পরে আছে। মাঝে মাঝেই জেলেদের কাছ থেকে সরে পানির কিনারায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সে, আঙুল তাক করে লেগুনের একটা নির্দিষ্ট জায়গা দেখাচ্ছে আর কি যেন বলছে। ভঙ্গি দেখে মনে হয় জেলেদের নিজের কথা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছে।

ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। কালো নিগ্রো স্প্যানিশ বলছে। ওবিন এতক্ষণ তার কথার ভাষান্তর করছিল, কিন্তু আমাকে দেখেই চুপ করে গেল। সবাই আমার দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকাল যেন ওরা আশা করছে আমাকে এই জটিল সমস্যার সমাধান করতে হবে।

আমাকে দেখে দু'পা সামনে বেড়ে করমর্দন করল অপরিচিত নিগ্রো; মনে হলো হাতের হাড় এই বুঝি ভেঙে গেল। আমি যে মুখ কুঁচকিয়েছি তা দেখে ফেলল। বিকট এক অট্টহাসি বেরিয়ে এলো নিগ্রোর মুখ থেকে। কাঁধ চাপড়ে দিল। এতই জোরে যে অসতর্ক থাকলে যেকোন ষাঁড়ও হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে যাবে।

পরিচিতির পালা শেষে ওবিন আমাকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলল।

অপরিচিত নিগ্রো এক অদ্ভুত বাজি ধরতে এসেছে। বলছে,

সাগর আর লেগুনকে যে সরু খাল সংযুক্ত করেছে, সেটা দিয়ে বড় একটা হাঙরকে লেগুনে ঢুকাবে সে; তারপর না খাইয়ে রাখবে হাঙরটাকে। যখন ওটা ক্ষুধার্ত হয়ে উঠবে, শুধু একটা ছুরি হাতে গ্রামবাসীর সামনে ওটাকে মোকাবিলা করবে সে। বিনিময়ে কী চাই? সামান্য টাকা পুরষ্কার। লোকটার নাম স্যামবো। এসেছে ডোমিনিকান রিপাবলিক থেকে। ওখানে নাকি প্রায় তিরিশটা হাঙর মেরেছে সে। আপাতত পাহাড়ী একটা গ্রামে বাস করছে স্যামবো। ওই গ্রামের একটা মেয়েকে বিয়ে করবে। মেয়েটার সঙ্গে ওর পরিচয় হয় পোর্ট অ প্রিন্সে।

পাহাড়ী গ্রামেই স্যামবো শুনেছে যে এই জেলে-গ্রামে দুই সাদা চামড়ার বিদেশী এসেছে। খবরটা পেয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ও বাজি ধরার আশায়। শিকার পর্ব দেখতে হলে সাদা চামড়ার মানুষদের প্রত্যেককে পঞ্চাশ ডলার করে দিতে হবে।

জেলেদের মনে সন্দেহ জেগেছে যে এর মধ্যে কোন চালাকি আছে, ফলে দ্বিধায় ভুগছে তারা। সামান্য একটা ছুরি হাতে হাঙরকে আক্রমণ করবে স্যামবো? এমন ঘটনা আগে কেউ কখনও দেখেনি। ওবিনের ধারণা কোন একটা ফন্দি এঁটে গরীব জেলেদের পকেট থেকে কয়েকটা গর্ডি খসিয়ে নেয়ার চেষ্টায় আছে স্যামবো। এব্যাপারে আমার কি ধারণা সেটা জানতে চাইল জেলেরা।

তবে আগেই প্রায় রাজি হয়ে বসে আছে জেলের দল। উত্তেজিত প্রত্যেকে। যেই মাত্র ঠিক হলো যে লড়াই শেষ হওয়ার আগে স্যামবো কোন টাকা পাবে না, সমস্ত দ্বিধা ভুলে গেল ওবিন। গ্রামে চিত্ত বিনোদনের কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এক সপ্তাহ পর পর রবিবারে মোরগের লড়াই হয়, তবে তাতে পুরুষরা কিছুটা আনন্দ পেলেও মহিলাদের মধ্যে এব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহ নেই। মহিলারা উৎসুক হয়ে থাকে সিনেমা দেখার জন্যে। মাসে একবার পোর্ট অ প্রিন্স থেকে একটা ভ্যান চালিয়ে গ্রামাঞ্চলে

আসে দুই মুলাটো। ভ্রাম্যমান সিনেমা; দেখানো হয় বন্দরে দুটো খুঁটির মাঝে সাদা কাপড় টাঙিয়ে। আলোড়ন পড়ে যায় গ্রামে। সিনেমাওয়ালা মুলাটোরা শুধু প্রাগৈতিহাসিক সিনেমা নিয়ে গ্রামে আসে তা নয়, তাদের সঙ্গে থাকে কেক, রঙিন ফ্রক, চিরুনি ইত্যাদি টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস। জেলেদের সারা মাসের লাভ প্রায়শই চলে যায় মুলাটোদের পকেটে।

স্যামবোর পরিকল্পনায় জেলেরা রাজি হয়ে যাবার পর দু'এক কথায় জানাল নিগ্রো কি করতে চায় সে। লেগুনের পানি যেখানে পাঁচ ফিটের বেশি নয় তেমন একটা জায়গায় ছুরি হাতে হাঙরের আক্রমণের অপেক্ষায় থাকবে স্যামবো।

নিজের অস্ত্রটা আমাদের দেখাল স্যামবো: বাঁকা হাতলওয়ালা দশ ইঞ্চি লম্বা একটা ছুরি, পাতের দু'দিকেই ক্ষুরের মতো ধারাল। স্যামবো বলল, খেলা দেখাতে গিয়ে তিনবার আহত হয়েছে সে। বাম উরুতে অর্ধবৃত্ত একটা ক্ষত-চিহ্ন দেখাল। তারপর জানাল আজ পর্যন্ত ও আক্রমণ করার পর একটা হাঙরও প্রাণে বাঁচতে পারেনি, লড়াই শেষে জিত ওরই হয়েছে।

খেলা দেখানোর বন্দোবস্ত শুরু করল জেলেরা।

সতেরো ফিট লম্বা আর তিন ফিট চওড়া একটা খাল দিয়ে হাঙরকে অগভীর কোন পুকুরে ঢোকানো যা-তা কথা নয়। পচা মাংসের টুকরো খালের পানিতে ফেলে হাঙরকে আকৃষ্ট করার প্রক্রিয়া শুরু করল স্যামবো। বিকেলে এলো হাঙরের প্রথম দল। খালের মুখে ভেসে থাকা টোপের দিকে ছুটে এলো ওগুলো, তারপর থেমে গেল আচমকা। ঘুরে চলে গেল সাগরের দিকে। হয় খিদে মরে গেছে হঠাৎ করে, নয়তো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওদের সতর্ক করে দিয়েছে, সামনে ফাঁদ পাতা আছে।

পরদিন একই পদ্ধতিতে হাঙরের দলকে আকর্ষিত করতে চাইল স্যামবো। খালের যে অংশ লেগুনের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে

দাঁড়িয়ে থাকল সে, কোন হাঙর লেগুনে ঢুকলেই কাঠের তক্তা দিয়ে খালের মুখ বন্ধ করে দেবে। কিন্তু একটা হাঙরও খালে ঢুকল না।

তৃতীয় দিন বিকেলেও কোন হাঙর এলো না। প্রতীক্ষা করতে করতে ধীরে ধীরে অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগল জেলেরা। খেলা দেখার জন্যে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হবে নাকি! কাজ সেরে ফিরে এসে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে খালের পাড়ে বসে গল্প করে ওরা, অপেক্ষার পালা শেষে বাড়ি ফেরার সময় মাথা নাড়ে, চেপে রাখে টিটকারির হাসি। তারপর সত্যি বারো-তেরো ফিট লম্বা একটা ক্ষুধার্ত নীল হাঙর লেগুনের পানিতে ঢুকে পড়ল।। ক্ষুধার্ত তা বোঝা গেল খাওয়ার পরিমাণ দেখে। খালের পানিতে ডোবানো মাংস খেয়ে সাফ করে দিল হাঙরটা, দেখে মনে হলো সযত্নে ঝাড়ু দিয়ে কেউ পরিষ্কার করেছে খালের মেঝে।

খিদে কমতে নিজেকে লেগুনের অগভীর পানির মধ্যে আবিষ্কার করে খুব অবাক হয়ে গেল দানবটা। কিছুক্ষণ দ্বিধান্বিত ভাবে ঘুরে বেড়াল এদিক ওদিক, তারপর ডুবে গেল ধীরে ধীরে। লেগুনের পানি স্বচ্ছ, একেবারে তলা পর্যন্ত দেখা যায়। আমরা দেখলাম লেগুনের মেঝেতে নিথর হয়ে শুয়ে আছে হাঙরটা।

বেরনোর পথ বন্ধ করে লেগুনের পাড়ে এসে দাঁড়াল স্যামবো, চিন্তিত চোখে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকল হাঙরের দিকে; যেন বুঝতে চাইছে কতটা দ্রুত নড়াচড়া করতে পারবে ওটা, আর চামড়াই বা কতখানি পুরু হবে।

বেশ কিছুক্ষণ পর প্রশান্ত একটা ভাব চলে এলো স্যামবোর চেহারায়, ঠোঁট প্রসারিত হলো চওড়া হাসিতে, গলা উঁচিয়ে ডাক দিল ও, গ্রামবাসীদের জানাল যে কাজের প্রথম পর্বটা সমাপ্ত হয়েছে। আরও তিন-চারদিন পর খেলা দেখানো হবে।

এগারো

স্যামবো আমাকে জানাল, তিন-চার দিন দেরি করা দুটো কারণে অত্যন্ত জরুরী। প্রথমত, হাঙরটাকে লেগুনের আকৃতি বুঝে নেবার সময় দিতে হবে; দ্বিতীয়ত, ক্ষুধার্ত করে তুলতে হবে ওটাকে, যাতে স্যামবো পানিতে নামা মাত্র আক্রমণ করতে তেড়ে আসে। পাঁচ নম্বর অধ্যায়ে আমি বলেছি হাঙর সাধারণত নিগ্রোদের আক্রমণ করে না। তবে এই হাঙরটাকে সেভাবে বিচার করলে চলবে না, এটাকে লেগুনে আটকে অভুক্ত রেখে হিংস্র করে তোলা হয়েছে।

'প্রথম আক্রমণ অবশ্যই ওকে করতে হবে,' বলল স্যামবো, 'তা নাহলে আমি ওকে খুন করতে পারব না।'

এবার কোন দ্বিধা না করেই বলল স্যামবো কিভাবে কি করতে চায় ও। শুনে বুঝলাম সহজ কিন্তু পোক্ত পরিকল্পনাই করেছে স্যামবো।

'হাঙরটা তেড়ে আসবে আমার দিকে। তারপর আমার উরুতে কামড় দেয়ার ঠিক আগে দেহটা ওপর-নিচে করবে। ওটাই মোক্ষম সময়। তখন একটুও দেরি না করে পিছিয়ে আসব আমি, হাত সামনে বাড়িয়ে হাঙরের গলায় চালিয়ে দেব ছুরি। হাঙর তখন দ্রুত ছুটছে। এতই দ্রুত যে থামতে পারবে না, নিজের জোরেই নিজেকে ছুরির ফলায় চিরে দেবে ওটা।'

তবে প্রথম আঘাতে হাঙর মারতে না পারলে অসুবিধে আছে।

'কারণ পরে রক্তের কারণে পানি ঘোলাটে হয়ে যায়, স্যামবো আর দেখতে পায় না। কমপ্রেন্দে, (বুঝেছ) সেনোর?'

স্বাভাবিক ভাবেই এই কাজে ঝুঁকি আছে প্রচণ্ড। কিন্তু ততটা নয় যতটা প্রথমে শুনে মনে হয়। পুরো ব্যাপারটা আসলে নির্ভর করছে ঠিক সময়ে পিছিয়ে আসার ওপর। দ্রুত পেছনে হঠতে হবে, চালাতে হবে ছুরি। এক সেকেন্ডের এদিক ওদিকে ঘটে যেতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা। (স্যামবো একবার পেছনে সরতে সামান্য দেরি করায় কামড় খেয়েছিল উরুতে।)

স্যামবো আরও বলল যে ডোমিনিকান রিপাবলিকে উৎসবের সময় যখন তীরবর্তী গ্রামগুলোতে প্রচুর লোক সমাগম হয়, তখন সে আর আরেকজন লোক হাঙর মারার এই খেলা দেখায়। জানাল বিয়ের পর আবার দেশে ফিরে যাবে সে। কথায় কথায় জানলাম এক আমেরিকান মুলাটোর কাছ থেকে হাঙর মারার বুদ্ধিটা শিখেছে স্যামবো আর তার সঙ্গী। ফ্লোরিডার জলাভূমিতে এই মুলাটো লোকটা প্রতিদিন ভাল টাকা আয় করত খালি হাতে অ্যালিগেটরের সঙ্গে লড়াই করে। প্রচুর ট্যুরিস্ট আসত তার খেলা দেখতে। এই নিগ্রোকে নিয়ে একটা স্বল্পদৈর্ঘ ছায়াছবিও হয়েছে।

অ্যালিগেটরের চোয়ালে একটা অদ্ভুত দুর্বলতা আছে, সেটারই সুযোগ নিত আমেরিকান নিগ্রো। প্রচণ্ড জোরে কামড় দিয়ে শিকারের হাড়গোড় চূর্ণ করে দিতে পারে অ্যালিগেটর, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে চোয়াল খোলার জন্যে যে মাংসপেশীগুলো দরকার, সেগুলো অ্যালিগেটরের নেই বললেই চলে। একবার বন্ধ চোয়াল চেপে ধরতে পারলেই খেল খতম, অ্যালিগেটরের সব চেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র আর কোন কাজেই আসে না। তখন জলাভূমির তীরে, দু'তিন ফিট গভীর পানিতে জমে ওঠে কুস্তি প্রতিযোগিতা। বেশির ভাগ সময়েই জিতে যায় নিগ্রো. অ্যালিগেটরকে টেনে তোলে ডাঙায়। তারপর তার সঙ্গীরা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে দানবটাকে।

'ও নিজেকে বলত,' বলল স্যামবো, '"খালি হাতে অ্যালিগেটর মারা প্রথম মানুষ।" তাই আমরা ঠিক করলাম, "খালি হাতে হাঙর মারা প্রথম মানুষ হব।"'

স্যামবো একটা ব্যাপার জানে না। তখন আমিও জানতাম না, কিন্তু খালি হাতে হাঙরের সঙ্গে লড়াইয়ের মাধ্যমে বীরত্ব প্রদর্শন করা পলিনেশিয়ানদের পুরনো একটা রীতি।

কয়েক শো বছর আগে, হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জে উৎসবের সময় রাজারা দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন করত; লড়তে হতো হাঙরের সঙ্গে। অস্ত্র বলতে প্রতিযোগীর কাছে থাকত শিঙের হাতলে বসানো হাঙরের একটা লম্বা দাঁত। জনশ্রুতি আছে প্রতিযোগী পেছন থেকে হাঙরকে আক্রমণ করত, তারপর লেজ আঁকড়ে ধরে সেঁটে থাকত গায়ে; এই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে বারে বারে আঘাত করত পেটে, ফুটো করে দিত হাঙরের পেট।

হাঙরটা লেগুনে ঢোকার চারদিন পর, রবিবারে, বিকেল তিনটের সময় লেগুনের পানিতে নামল স্যামবো।

লেগুনের পাড়ে জড় হওয়া গ্রামবাসীদের দেখলে অবাক হতে হয়। দুনিয়ার এই শেষ প্রান্তে, যেখানে জন বসতি বিরল, সেখানে প্রত্যেকে পরে আছে নিজের সেরা পোশাকটা, যেন *ক্যাবেন চৌকাউনের উৎসবে যাচ্ছে। ওদের পরনে টাই, শক্ত মাড় দেয়া কলার, সাদা জ্যাকেট অথবা কালো স্যুট। কেউ কেউ আবার পরেছে দাদার আমলের ডিনার জ্যাকেট, দেখে মনে হয় বংশ পরম্পরায় হাইতির সব কয়টা পার্টিতে ওগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য তার আগে প্রাচীন জেলেরা জ্যাকেটগুলো কিনেছিল পোর্ট অ প্রিন্সের কোন পুরনো পোশাকের দোকানদারের কাছ থেকে, অথবা চলচিত্র দেখাতে আসা মুলাটোরা গছিয়ে দিয়েছিল। সবার পোশাকই পুরনো আর নোঙরা, কিন্তু গলা পর্যন্ত বোতাম

* পোর্ট অ প্রিন্সের নাইট ডাইভ। নাচ-গান এবং মদ্যপানের আসর।

আটকে রাখতে ভোলেনি কেউ।

মহিলারা মাড় দেয়া ফ্রক পরেছে। হাতে কার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি করা হাত-পাখা, বাতাস করছে নিজেদের।

স্যামবোর খেলা দেখানোর প্রথম পর্ব সমাপ্ত হবার পর থেকে লেগুনের পাড় দিয়ে যে-ই গেছে, তাকিয়ে দেখেছে হাঙরটাকে। ওটা তখন গোল হয়ে ধীর গতিতে চক্কর মারছে লেগুনের তলায়, খুঁজে বেড়াচ্ছে খাবার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রামবাসীরা হাঙরটাকে দেখেছে, পাথর ছুঁড়েছে ওটার দিকে, মজা পেয়েছে ওটাকে দেখে। আর এখন, এই মুহূর্তে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সবাই, নিঃশ্বাস আটকে অপেক্ষা করছে অধীর আগ্রহে।

লেগুনের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে পাথর ছুঁড়ে হাঙরটাকে আকৃষ্ট করছে একজন জেলে, যাতে স্যামবো পানিতে নেমে নিজের পছন্দ মতো লড়াইয়ের জায়গা বেছে নিতে পারে। পাড়ের কয়েক গজ দূরে থামল স্যামবো। পানি ওখানে ওর নাভির খানিক ওপরে।

হাঙরটাকে কোথাও দেখা গেল না। তারপর হঠাৎ লেগুনের এক কোণে সুর্যের আলো ছোট ছোট গোল তরঙ্গে প্রতিফলিত হলো, দেখা গেল ভেসে উঠেছে হাঙরের পাখনা। স্যামবোর দিকে ধীর গতিতে এগিয়ে এলো ওটা। শ্বাস আটকে রেখেছে সবাই। চোখ বড় বড়। ডুবে গেল পাখনা, পেছনে রেখে গেল ফেনার অস্পষ্ট একটা রেখা।

দুই হাঁটুর মাঝখানে ছুরিটা ধরে কুঁজো হলো স্যামবো। ও এখন তৈরি। চুপ করে আছে সবাই, পরিবেশে টান টান নীরব উত্তেজনা, চারপাশে একটা আওয়াজ নেই।

স্যামবো যেখানে পা রেখেছে, তার দুই গজ সামনে লেগুনের বালুময় মেঝে হঠাৎ করে নেমে গেছে দুই ফ্যাদম গভীরতায়। ওখানে এসে থামল হাঙরটা, নাক তাক করে রেখেছে স্যামবোর দিকে। একটা কাঁপুনি উঠল ওটার সারা দেহে। মনে হলো এখনই আক্রমণ করে বসবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ঘুরে চলে গেল

ওটা…ফিরে এলো আবার। বার বার ঘটল এমন। হাঙরটা প্রতিবার ঘুরে এলেই গুঞ্জন করে উঠল গ্রামবাসী।

তারপর শেষ বারের মতো ফিরে এলো হাঙর, থামল নিগ্রো শিকারির কয়েক গজ সামনে। যখন মনে হলো ফিরে যাবে আবার, ঠিক তখনই পা দিয়ে বালি পরীক্ষা করে একটু পিছিয়ে গেল স্যামবো, হাঙরটাকে প্রলুব্ধ করার জন্যে।

এরপরের ঘটনা লেগুনে তোলপাড়, ছিটকে ওঠা পানি আর ফেনায় কিছুই দেখা গেল না।

কয়েক সেকেন্ড পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল স্যামবো। বোধহয় হাঙরই ওর লক্ষ্য। বিক্ষুব্ধ পানির নিচে থাকায় হাঙরটাকে আমরা দেখতে পেলাম না। মনে হলো অনেকক্ষণ পানির নিচে থাকল স্যামবো, তারপর দেখা মিলল ওর। হাত উঁচু করে ছুরিটা গ্রামবাসীকে দেখাল স্যামবো। আরেক হাতে লেগুনের যেখানে হাঙরটা ডুব দিয়েছে সেখানটা নির্দেশ করল।

সার্কাসের দড়াবাজ দুটো ডিগবাজি শেষ করে দড়ি ধরে ফেললে যেরকম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দর্শকরা, ঠিক তেমনই একটা আওয়াজ উঠল গ্রামবাসীদের মধ্যে। মুখে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না কেউ। গ্রামবাসীদের মনোভাব এমন: পুরো ব্যাপারটাই বেশি দ্রুত ঘটে গেছে, এবং তাদের পয়সা উসুল হয়নি।

একটু পরেই হাঙরটাকে লেগুনের তীরে, বালিতে তুলে আনা হলো। আমরা দেখলাম, হাঙরের পেট থেকে একেবারে লেজ পর্যন্ত চিরে দিয়েছে স্যামবো। এতই নিখুঁত ভাবে, যে দেখে মনে হয় কোন সার্জনের নিপুণ হাতের কাজ। রক্ত আর নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে ক্ষত থেকে। তাতে কয়েকজন গ্রামবাসী মাথা দুলিয়ে আত্মতৃপ্তির প্রকাশ ঘটাল। পানির ওপরে আনার পর বোঝা গেল যত বড় মনে করা হয়েছিল হাঙরটাকে, আসলে ওটা তার

দ্বিগুণ আকৃতির। সন্দেহ নেই নিজের কাজ চমৎকার ভাবেই সেরেছে স্যামবো।

সেদিন বাকি সময় গান-বাজনা আর মদ্যপানেই কেটে গেল। বাজনার জন্যে ব্যবহৃত হলো বহু পুরোনো একটা গ্রামোফোন। ওটাও চলচ্চিত্র দেখাতে আসা নিগ্রোদের 'উপহার'। মাঝরাতে ঘুমিয়ে পড়ল সারা গ্রাম। মাত্রাতিরিক্ত অ্যালকোহলের কারণে কয়েকজন পড়ে আছে সৈকতের বালির ওপরে, পরনে তাদের ডাবল ব্রেস্টেড স্যুট আর প্রাচীন ডিনার জ্যাকেট। অদ্ভুত একটা দৃশ্য। হঠাৎ দেখলে যে কেউ ভেবে বসবে যে সাগরে কোন জলযান ডুবে গেছে, বৈকালিক পোশাক পরা যাত্রীরা ঢেউয়ের বাড়িতে সৈকতে এসে পড়ে আছে।

ক্যারিবীয়ানে বেড়াতে এলে *মারোনির প্রাক্তন বাসিন্দাদের কথা কারও কানে যেতে পারে। অ্যান্টিল্‌স্ থেকে মেক্সিকো, ভায়া পানামা, কোস্টা রিকা, নিকারাগুয়া, স্যান সালভাদর, হন্ডুরাস বা গুয়েতেমালা পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে মারোনির অন্তত দশ জন প্রাক্তন বাসিন্দার দেখা পাওয়া যাবেই যাবে। আমি তাদের একজনের কাছে কৃতজ্ঞ। জেলে-গ্রাম থেকে পোর্ট অ প্রিন্সে চলে আসার দু'দিন পর সন্ধেয় লোকটার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল জন্সফেয়ার।

মাত্র আমরা আফ্রিকান ক্রাল আকৃতির নাইটক্লাব ক্যাবেন চৌকাউনে ঢুকেছি, একজনের ওপর চোখ আটকে গেল জন্সফেয়ারের। একটা টেবিলে এক নিগ্রেসকে সামনে নিয়ে বসে আছে লোকটা। আমার দৃষ্টি তার দিকে আকর্ষণ করল জন্সফেয়ার। সাদা ডিনার জ্যাকেট পরা লোকটার বয়স হবে পঞ্চাশ, মাথা জোড়া টাক, বেশ একটা নধর ভুঁড়ি গজিয়েছে, বোঝা যাচ্ছে ডিনার জ্যাকেটের ওপর দিয়ে। মুখটা বোকা বোকা।

*ফ্রেঞ্চ গায়ানার নদী মারোনি। ওখানে একটা প্রাচীন কারাগার আছে।

তার সামনের নিগ্রো মহিলা অদ্ভুত সুন্দরী। পরনে হাল আমলের প্যারিস ফ্যাশন, সাদা ট্যাফেটার গাউন।

মহিলাকে নিয়ে নাচে যোগ দিল লোকটা। আমরা তাকিয়ে থাকলাম। মহিলার গায়ে অসংখ্য দামী গহনা, আর প্রাক্তন কয়েদীর ডানহাতের আঙুলে শোভা পাচ্ছে একটা মস্ত হিরে বসানো আঙটি। আলো পড়ে দ্যুতি ছড়াচ্ছে হিরেটা।

'ও রপ্তানীকারক,' নিচু গলায় আমাকে বলল জন্সফেয়ার। 'রপ্তানী করা যায় এমন সব কিছুই রপ্তানী করে ও। কফি, রাম, চিনি, কলা থেকে শুরু করে আরও অনেক কিছু। ওই নিগ্রো মহিলা ওর বউ। মাসে একবার করে নিউ ইয়র্কে যায় ও, বউকে ছাড়া। ক্লাবের বাইরে যে মার্সিডিজটা দেখলে, ওটাও ওর। উনিশ শো সাতাশ সালে মার্সেইলে সশস্ত্র ডাকাতি করে ও, তারপর কিছুদিন পর একটা খুনের দায়ে জেল হয়। বিশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। দুইবার পালিয়েছিল।

জন্সফেয়ারকে দেখেই প্রাক্তন কয়েদীর মুখে চওড়া হাসি ফুটল। বউয়ের কানে কানে কি যেন বলল, তারপর বউকে নাচের মঞ্চে রেখে এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। পরিচয় পর্ব সেরে টেবিলে বসলাম আমরা। আগে ওরা শ্যাম্পেন পান করছিল, তাই আমাদেরও শ্যাম্পেন নিতে হলো। শ্যাম্পেনের ফাঁকে ফাঁকে আলাপ চলতে লাগল।

তারপর জন্সফেয়ার নাচতে গেলে আমার আরও কাছে সরে এলো লোকটা। টেবিলে কনুই রেখে ক্ষুদে ক্ষুদে ধূসর চোখে শুভেচ্ছা নিয়ে তাকাল। আমার হাঙর শিকারের ইচ্ছার কথা জানে, তাই ওই প্রসঙ্গেই কথা বলতে লাগল। আমি আগ্রহ নিয়ে শুনলাম। নিকারাগুয়ার লেক নিকারাগুয়ায় হাঙর আর টারপন শিকার, দুটোই করেছে সে। জানাল বিশাল লেক নিকারাগুয়া। এতই বড় যে দেখলে মনে হয় স্থলভূমিতে সত্যিকারের একটা সাগর। আসলেও তাই ছিল ওটা। কয়েক মিলিয়ন বছর আগে

ক্যালিফোর্নিয়ার মতোই একটা উপসাগর তৈরি হয়েছিল ওখানে। পরে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সুউচ্চ পর্বতসারি মাথা তোলে, উপসাগরের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে নোনা পানি রূপান্তরিত হয় মিঠে পানিতে, সেই মিঠে পানিতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয় হাঙরের দল।

'সেজন্যেই লেক নিকারাগুয়া দুনিয়ার একমাত্র জায়গা যেখানে আপনি মিঠে পানিতে হাঙর শিকার করতে পারবেন। রঙের দিক থেকে একটু হালকা হলেও আর সব দিক দিয়ে লেক নিকারাগুয়ার হাঙর সাগরের হাঙরের মতোই। আমি কয়েকটা ধরেছি যেগুলো ছিল বিশ ফিটেরও বেশি লম্বা–সত্যিকারের প্রাগৈতিহাসিক দানব। তার মাত্র কয়েকদিন আগেই আমি দ্বিতীয়বারের মতো জেল থেকে পালিয়েছিলাম।' চুপ করে গেল লোকটা। চোখে প্রশ্ন নিয়ে আমার দিকে তাকাল। জানতে চায় আমি তার অতীত সম্বন্ধে কিছু জানি কিনা। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'এখনও আমার এক বন্ধু আছে ওখানে। সে-ও আমার মতোই মার্সেইলেসের লোক। যদিও বেশ কয়েক বছর হলো দেখা নেই ওর সঙ্গে, তবে একই সঙ্গে পাঁচ বছর জেল খেটেছি আমরা, পালিয়েছিও একই সঙ্গে। চিঠিতে যোগাযোগ আছে। ওকে চিঠি লিখেছিলাম এখানে যাতে চলে আসে। ভাল একটা কাজ আছে এখানে, ওকে দেয়ার জন্যে। অথচ আসবে না ও, মশা আর জ্বরের ভয় নিয়ে ওই লেক নিকারাগুয়ার তীরেই রয়ে যাবে। কেন?'

মহিলা সঙ্গিনীকে নিয়ে জন্সফেয়ার ফিরে আসায় মোটা হাতে খুব সাবধানে শ্যাম্পেন ঢেলে গ্লাস দুটো সামনে বাড়িয়ে দিল সে। ওরা বসার পর বলল, 'কেন আসতে যাবে ও? স্যান হুয়ান নদীর মোহনায় কোস্টা রিকার সীমান্তে স্যান কার্লোসে বাস করে ও। আস্ত একটা দোজখ স্যান কার্লোস। অথচ বোকাটা ওখানেই থাকবে বলে ঠিক করেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভেবে আমাকে বলল, 'ইচ্ছে করলে

আপনি নিকারাগুয়ায় যেতে পারেন। যদি হাঙর শিকার করতে চান তাহলে স্যান কার্লোসে যাবেন। ওখানে আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে আপনার। ওর নাম হচ্ছে...' একটু দ্বিধা করল লোকটা। তারপর বলল, 'ধরা যাক ওর নাম মার্শাল। ওর আসল নাম কি তাতে কিছু যায় আসে না। ওখানে ওরা ওকে অ্যালভারেজ নামেই ডাকে।'

দু'দিন পর। বসে আছি চুপ করে। আকাশযানটা আমাকে নিয়ে চলেছে নিকারাগুয়ার দিকে।

রাজধানী ম্যানাগুয়াতে ঢুকতে হলে প্রবেশ কর দিয়ে ঢুকতে হয়। এই প্রবেশ কর সরাসরি চলে যায় প্রেসিডেন্ট সোমোযার ব্যক্তিগত তহবিলে। (অত্যন্ত ধনী লোক সোমোযা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী গোটা আমেরিকার তৃতীয় ধনী ব্যক্তি।) নিকারাগুয়ার জন্যে এটাই স্বাভাবিক। যার হাতেই ক্ষমতা গেছে নিজের রাজ্য মনে করে শাসন করেছে সে রাজার হালে। দেশের উন্নতি যতটা করেছে তার সহস্রগুণ উন্নতি করেছে নিজের। আমি যখন নিকারাগুয়াতে নামলাম, প্রেসিডেন্ট তখন অ্যানাস্টাশিয়ো সোমোযা। উনিশ শো ছাপ্পান্ন সালের শেষ ভাগে সে আততায়ীর হাতে খুন হয়। ক্ষমতায় বসে তার বড় ছেলে। অর্থাৎ সাতান্ন হাজার এক শো চুয়াল্লিশ বর্গ মাইলের রাজত্ব রয়ে গেল ওই পরিবারেরই হাতে।

ম্যানাগুয়ায় পৌঁছাবার পর আমার মুখ্য উদ্দেশ্য দাঁড়াল লেক নিকারাগুয়া আর তার মিঠে পানির হাঙরের কাছে যাওয়ার একটা উপায় বের করা। কোন ট্রেইন আমাকে লেকের কাছে নিয়ে যাবে সেই দুরাশা আমি করলাম না। এই দেশটা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান দিয়েই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে জন্সফেয়ার, কাজেই কল্পনায় সময় নষ্ট করলাম না। আশা করলাম লড়ঝড়ে দুয়েকটা বাস অন্তত পাওয়া যাবে। তাও যদি না পাওয়া যায় তাহলে গরুর

গাড়িই ভরসা। কিন্তু তখনও কল্পলোকে বিচরণ করছি, জ্ঞান হতে অনেক বাকি আছে। রাস্তা থাকলে তবেই না যানবাহনের প্রশ্ন! লেক নিকারাগুয়ায় যাবার মতো কোন রাস্তা নেই। একমাত্র মেঠো পথ যেটা আছে সেটা গেছে গ্রানাডায়, লেক নিকারাগুয়ার উত্তরে। অথচ আমি যাব দক্ষিণে।

কোন নৌকো ভাড়া নেব সেই আশাও নেই। নৌকো ভাড়া নিতে হলে অবিশ্বাস্য রকমের মোটা অংকের টাকা দিতে হবে। তাছাড়া কোন নৌকোও নেই। প্রেসিডেন্ট সোমোযার কয়েকটা অ্যারোপ্লেন আছে, এমনকি একটা হেলিকপ্টারও। এটা কি সম্ভব যে আমাকে সে ওগুলোর একটা দেবে? আমাকে বলা হয়েছে প্রেসিডেন্ট সোমোযা অত্যন্ত সমঝদার লোক। আমি চাইলে তিনি অবশ্যই সময় দেবেন, আমি যাতে হাঙর শিকারে যেতে পারি সেজন্যে প্রয়োজনবোধে নিজেকে কেটে দু'ভাগ করতেও দ্বিধা করবেন না। প্রতি রোববার তিনি নাকি মাছ ধরেন। তবে সেই মাছ হাঙর নয়। আর লেক নিকারাগুয়ার মতো দূরের জলাভূমিতেও তিনি যান না। ধরা যাক প্রেসিডেন্ট রাজি হলো, তাতেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। লেকের দক্ষিণে কোন বিমানবন্দর নেই যে আকাশযান নামতে পারবে। আর হেলিকপ্টার? খবর নিয়ে জানলাম হেলিকপ্টার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখন মেরামত করা হচ্ছে।

'উপযুক্ত সময়ের জন্যে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে,' বলল পিয়েরে ড্রেইফাস। ড্রেইফাস খুবই চালু এক ফ্রেঞ্চম্যান। ম্যানাগুয়াতে সুপার স্টোর দিয়ে বিরাট বড়লোক হয়ে গেছে। তার দোকানে বাইসাইকেলের স্পোক থেকে শুরু করে মডেলদের গাউন পর্যন্ত সবই পাওয়া যায়। 'আর উপযুক্ত সময় কখন আসবে সেটা আপনি আগের মুহূর্তেও টের পাবেন না। ঠিক মোমোটোমবো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো।'

এই মোমোটোমবো আগ্নেয়গিরির খ্যাতির অন্যতম কারণ

ভিক্টর হিউগোর লিজেন্ড দ্য সিয়েকল্‌স্‌ গ্রন্থে এটির উল্লেখ আছে। ম্যানাগুয়ার জন্যে বিরাট একটা হুমকি এই মোমোটোমবো। সামনে ঝুঁকে আসা চুড়ো থেকে সর্বক্ষণ ঘন, সাদা ধোঁয়া বের হচ্ছে, সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছে আসন্ন বিপদের কথা। উনিশ শো তিরিশ সালের এক অগ্ন্যুৎপাতে পুরো ম্যানাগুয়া শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, দেশের সব চেয়ে দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয় মোমোটোমবো। বসে থাকতে ভাল লাগছিল না, তাই আমি গিয়ে জ্বালামুখটা দেখে এলাম। এক সপ্তাহ পর আবেদন করলাম প্রেসিডেন্টের দপ্তরে। আমার অনুরোধ বিবেচনা করা হলো।

সেদিন বিকেলে প্রেসিডেন্টের জীবন বৃত্তান্ত ভাল করে জেনে নিলাম। লোকটা অত্যন্ত করিৎকর্মা আর তীক্ষ্ণধী টের পেয়ে মনে মনে বেশ একটা স্বস্তি অনুভব করলাম। আমার আবেদন যখন তার হাতে পৌঁছুল তখন তার কি কি সম্পদ ছিল সেসবের একটা ছোট বর্ণনা না দিয়ে পারছি না। নিকারাগুয়ার আবাদী জমির তিন ভাগের এক ভাগ সোমোযার। উত্তোলিত স্বর্ণের পাঁচ ভাগের এক ভাগের মালিকও এই সোমোযা। আছে কাপড় কল আর খবরের কাগজ। খবরের কাগজটা আবার দেশের সেরা দৈনিক। এছাড়া গরু এবং কুইনিন রপ্তানী ব্যবসায় সে ছাড়া আর কেউ নেই। আর এত সব সোমোযা করেছে মাত্র আঠারোটি বছরে! কাজ শুরু করেছিল সে নকল সোনার কয়েন তৈরি করে বাজারে ছাড়ার মাধ্যমে।

আবেদন জমা দেয়ার পরদিন প্রেসিডেন্ট সোমোযার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি মিলল। জবাবটা এলো টেলিগ্রামের মাধ্যমে। তাতে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা হয়েছে: বিকেল ঠিক তিনটের সময় প্রেসিডেন্ট দেখা দেবেন।

টেলিগ্রামটাকে পাসের মতো দেখিয়ে তিন সারি প্রহরা পার হয়ে প্রেসিডেন্টের দপ্তরে হাজির হলাম আমি।

ভেতরে দেখলাম গার্ড অভ অনার দিচ্ছে ন্যাশনাল গার্ডের

দল। সবখানেই আছে ওরা। পরনে খাঁকি শার্ট আর ট্রাউজার্স। কোমরে রিভলভার, অথবা কনুইয়ের ভাঁজে সাবমেশিনগান। আমাকে একটা অ্যান্টিরুমের নিয়ে আসা হলো। ওখানে অপেক্ষা করছে দশ-বারোজন সাধারণ নিকারাগুয়ান। অভিযোগ নিয়ে এসেছে ওরা, কয়েকজন অপেক্ষা করছে আজ সপ্তাহ খানেক হলো। খাওয়া এবং ঘুমের জন্যে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যায় ওরা, তারপর বিশ্রাম নিয়ে ফিরে এসে আবার বসে চামড়া মোড়া বেঞ্চিতে। অপেক্ষায় থাকে কখন প্রেসিডেন্টের ডাক আসে।

সবাইকেই দেখা দেয় সোমোযা, কাজেই অপেক্ষা শুধু উপযুক্ত সময় আসার। শুনেছি জনসাধারণের ছোটখাটো সমস্যার সমাধান দিতে ভালবাসে সোমোযা। দর্শনার্থী যত নগণ্যই হোক, কথা বলে স্নেহশীল বাবার মতো। সেজন্যেই এই অপেক্ষারত লোকগুলো মোটেই অধৈর্য নয়, কথা বলছে নিজেদের মাঝে, হাসছে প্রাণ খুলে। ওদের দেখলে বোঝা যায় ধৈর্য আছে সাধারণ নিকারাগুয়ানদের, তাদের কৌতুক বোধও কম নয়। এক ঘণ্টা পর অ্যান্টিরুমের দরজা খুলে গেল। এক সপ্তাহ ধরে অপেক্ষারত লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে আমি প্রবেশ করলাম প্রেসিডেন্সিয়াল অফিসে। একবারও মনে হলো না প্রতিবাদের ইচ্ছে জাগল ওদের কারও মনে।

বিরাট ঘরটা দেখলে বাজারের কথা মনে আসে। সোমোযা যে বিশাল টেবিলটার পেছনে বসে আছে, ওটার ওপরে অগোছাল পড়ে আছে শত শত জিনিস। সবই দর্শনার্থীর দেয়া উপহার। বেশির ভাগই ছোট ছোট মূর্তি। প্রেসিডেন্টের একপাশে একটা ভার্জিন অভ দ্য সেভেন সরোজের বড় মূর্তি, অন্যপাশে ধাতুর কারুকাজ করা একটা বেজবল ব্যাট।

আমাকে দেখে ক্লান্ত হেসে উঠে দাঁড়াল সোমোযা, আন্তরিকতার সঙ্গে হাত মেলাল। ভদ্রতার কোন অভাব দেখলাম না তার মধ্যে। কুশলাদী বিনিময়ের পর মুখোমুখি বসলাম

আমরা। ক্ষুদে মূর্তিগুলোর ওপর দিয়ে চলতে লাগল আমাদের আলাপচারিতা।

ন্যাশনাল গার্ডদের মতোই খাকি ইউনিফর্ম পরে আছে প্রেসিডেন্ট। লোকমুখে যেমন শুনেছি সোমোযা ঠিক তাই। নিকারাগুয়ার মানুষ ঠিকই বলে তাদের প্রেসিডেন্ট সম্বন্ধে। সাদাসিদে, হাসিখুশি, দয়ালু লোক; যার অন্যতম আনন্দ হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশে হাঁটা, পিকনিকে অংশ নেয়া আর অশ্লীল সব গল্প বলা। আমি অনুভব করতে পারলাম, এখানে এই রাজকীয় অফিসঘরে বসে থাকার বদলে বোওল্‌স্‌ খেলতে পারলেই বেশি আনন্দিত হতো এই লোক। ছয়জন ভয়ানক চেহারার ন্যাশনাল গার্ড ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সর্বক্ষণ তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে স্বৈরাচারীর পেশায় বিশ্রাম নেবার কোন উপায় নেই। আর পকেটে হাত ভরতে গেলেই আমার মনে হচ্ছে চোখের এক্স রে মেশিনের নিচে আমাকে রাখা হয়েছে। কে জানে, হয়তো গোপনে অস্ত্র বহন করছি আমি!

ইউরোপ, বিশেষ করে ফ্রান্সকে কত ভালবাসে সেটা লম্বা একটা বাক্যে আমাকে জানাল সোমোযা। দুঃখ প্রকাশ করল ওখানে কখনও যাওয়া হয়ে ওঠেনি বলে। তারপরই তাকে খুব বিরক্ত আর ক্লান্ত দেখাল।

আমি যখন হাঙরের কথা তুললাম, সোমোযার নীল চোখে উৎসাহের দ্যুতি জ্বলে উঠল। বোঝা গেল এতক্ষণে পছন্দ মতো প্রসঙ্গ পেয়েছে। টেবিল ছেড়ে আমাকে নিয়ে উঁচু একটা টেরেসে এসে দাঁড়াল সে। টেরেস থেকে ম্যানাগুয়া শহরের বেশির ভাগটাই দেখা যায়। সেদিকে হাত নেড়ে দু'এক কথায় আমাকে সে যা বলল তা থেকে বুঝলাম শহরের এই সুন্দর পরিবেশ ছেড়ে, এই আরাম আয়েস ছেড়ে ম্যালেরিয়ার রাজ্যে যাওয়া মোটেও উচিত হবে না আমার। লেক নিকারাগুয়ায় যাবার ব্যাপারে কথা এই পর্যন্তই এগোল।

আর মাছ ধরার ব্যাপারে, আগামী রোববার প্রশান্ত মহাসাগরে যাবে সোমোযা, আমাকে আন্তরিকতার সঙ্গে আমন্ত্রণ জানানো হলো।

দিনটা ছিল চমৎকার, সূর্যের সোনালী আলোর প্রাচুর্য ভরা একটা দিন। প্রচুর আলো, প্রচুর পানি, আর প্রচুর ন্যাশনাল গার্ড।

জায়গাটার নাম পুয়ের্তো সোমোযা। নির্মাণাধীন বন্দর, ডকটাও নির্মাণাধীন–কাজ শুরু হয়েছে বেশিদিন হয়নি, তবে বন্দরটা চালু করে দেয়া হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে প্রেসিডেন্ট সোমোযা ক্ষমতায় থাকলে শিগ্‌গিরই চেহারা ফিরে যাবে এই বন্দরের। সব মিলিয়ে দশজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সবাই আমরা ছোট একটা মোটর বোটে উঠে বন্দরটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরের খোলা পানিতে আধঘণ্টা ঘুরে বেড়ানোরও সাহস দেখানো হলো। স্টার্নে বসে থাকল সোমোযা, সূর্যের আলো যাতে চোখে না লাগে তাই মাথায় কানা সামনে বাড়ানো ক্যাপ। তাতে লেখা: সোমোযাকে ভোট দিন। দুনিয়ার তৃতীয় ধনী ব্যক্তি হাভানার দরিদ্র জেলের মতো করেই মাছ ধরে, লাঠির মাথায় প্যাঁচানো দড়ি দিয়ে।

কোন মাছ প্রেসিডেন্টের ছিপে ঠোকর দিল না, ফলে তীরে ফিরে এলাম আমরা। খোলা একটা ছাউনির নিচে লম্বা একটা টেবিল পাতা হয়েছে। সেখানে বসেই দুপুরের খাবার সারলাম। খাবার বেড়ে দিল বেয়ারার পোশাক পরা একদল বাচ্চা ছেলে। মাছির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খাবার শেষ করতে হলো আমাদের।

শেষ বিকেলে গাড়ি-বহর আবার ফিরে এলো ম্যানাগুয়াতে। শেষ হলো প্রেসিডেন্টের রোববার।

বারো

কয়েক দিন পর ম্যানাগুয়ার দুটো হোটেলের একটায়, লিডোর বারে ঢুকলাম আমি। এক জনের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। লোকটা উদ্ভট কিসিমের। ক্যারিবীয়ানে আসার পর থেকে যত অদ্ভুত লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে এও তাদের মধ্যে একজন। আগে ছিল ফরেইন লিজিয়নের সার্জেন্ট এবং মার্সেনারি। ছয়টা আর্মির ইউনিফর্ম গায়ে পরেছে। এখন ছোট এক দোকানদার। লোকে এই রহস্যময় মানুষটাকে কর্নেল ল্যাযলো প্যাটাকি বলে ডাকে।

অতীতের সঙ্গে যোগাযোগটা দৃঢ় করার জন্যে বছরে এক দু'বার পায়ে বুট গলায় ল্যাযলো, দোকানের চাবিটা দরজার নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে শিকার করতে একা চলে যায় নিকারাগুয়ার দুর্গম অঞ্চলে–যেখানে মানুষের পা পড়েনি এখনও। শুনেছি প্রায়ই লেক নিকারাগুয়ার তীরে যায় সে। বলতে পারবে কি করে স্যান কার্লোসে পৌঁছুনো যায়। ল্যাযলোর বয়স হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেখতে দয়ালু আর ভদ্র, যদিও শরীরের গঠন তার হেভিওয়েট বক্সারের মতো। হাতগুলো রুক্ষ আর শক্ত। মধ্য ইউরোপের কোথাও তার জন্ম, বোধহয় ভুলেই গেছে কোথায়, তাই ইউরোপের নাম মুখেও নেয় না ল্যাযলো।

ডিনারের পর কান্ট্রি ক্লাবে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার। কান্ট্রি ক্লাবে ইউরোপিয়ানরা আসে, বিকেলের অবসর সময়টা

পোকার বা ব্রিজ খেলে পার করে। নামকরা একটা হুইস্কির জেনারেল এজেন্টের কাছ থেকে কয়েক ডলার জিতেছিল প্যাটাকি, কাজেই আমরা সবাই ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম লিডো বারে, যাতে হুইস্কি কোম্পানিকে তাদের টাকা ফেরত দেয়া যায়।

দুপুর প্রায় দুটো বাজে। বার প্রায় খালি; হোটেলের সবুজ পানি ভরা নিথর পূলের কাছে শুধু দুটো টেবিলে লোক আছে। সেগুলোর একটায় সাদা স্যুট পরা দু'জন লোক নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ম্যানাগুয়া অতি পরিচিত জায়গা হওয়া সত্ত্বেও লোকগুলো কে সেটা প্যাটাকি বলতে পারল না। তবে অভিযাত্রীর সবচেয়ে বড় গুণ, অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ জমানো, সেটা প্যাটাকির আছে। শিগ্‌গিরই আমরা লোক দুটোর সঙ্গে এক টেবিলে বসে আলাপ চালাতে লাগলাম।

বছরে মাত্র দু'বার কি তিনবার ওরা ম্যানাগুয়ায় আসে। জার্মান। নিকারাগুয়াতে বসতি করেছে আজ তিরিশ বছর হলো। থাকে স্যান কার্লোসে। লেক আর আটলান্টিকের তীরের মাঝে একটা ছোট সোনার খনি আছে ওদের। দক্ষিণ আমেরিকার ওই জায়গাটা একাধারে অপরিচিত এবং খনিজ সম্পদে দুনিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল।

এক ঘণ্টা আগে ল্যাযলো প্যাটাকি বলেছে গতবার সে খচ্চরের পিঠে চেপে লেক নিকারাগুয়ার দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছেছিল। এই তথ্যটা জানার পর থেকেই আমার মিঠে পানির হাঙর শিকারের আশা দিগন্তে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তবে এই দুই জার্মানকে দেখে মনে হলো না তারা খচ্চরের পিঠে চেপে স্যান কার্লোস থেকে পাড়ি জমিয়েছে। আলাপ করে জানতে পারলাম তারা স্যান কার্লোস থেকে গ্রানাডায় এসেছে ছোট মোটর বোটে করে। সেখান থেকে পিটার লোরের মতো দেখতে বেঁটে, গালকাটা জার্মানের পুরনো গাড়িতে করে পৌঁছেছে রাজধানী। গ্রানাডা বেশি দূরে নয় ম্যানাগুয়া থেকে। আর এক সপ্তাহ পর

ফিরে যাবে ওরা। আমাকেও যেতে আমন্ত্রণ জানাল। ওরা আরও একটা উপকার করবে, যেহেতু স্যান কার্লোসের আগেই একটা বিশেষ কাজে ওদের নামতে হবে, তাই যাত্রা কয়েক ঘণ্টা দীর্ঘ করে আমাকে নামিয়ে দেবে স্যান কার্লোসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম বিশেষ কোন জিনিস আমাকে নিতে হবে কিনা। যেমন বুট, রিভলভার ইত্যাদি।

'নাইন!' বিরাট এক হাসি শেষে জবাব দিল পিটার লোর। 'শুধু কুইনিনের পোঁটলা নেবেন!'

এক সপ্তাহ পর গ্রানাডাকে পেছনে ফেলে এলাম আমরা। নদীতে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের মোটর বোট। তিরিশ ফিট লম্বা ওটা। সোনার খনির রসদপত্রে বোঝাই। এছাড়া আছে পাথর ভেঙে সোনা বের করে যে বিশাল মেশিন, সেটার যন্ত্রাংশ।

খনিটা আসলে আকাশের নিচে খোলা একটা জায়গায়। বিশজন লোক কাজ করে ওখানে। শাবল দিয়ে যেসব পাথর আলগা করে তার মধ্যে কখনও কখনও পাওয়া যায় সোনার বড় তাল, তবে তা দুর্লভ। বেশিরভাগ সময়েই পাথর চূর্ণবিচূর্ণ করে ছাঁকনি দিয়ে ছাঁকার আগে কোন সোনা পাওয়া যায় না।

ব্রেনেকার, ছোট খনিটার প্রকৌশলী, নৌকোর গলুইয়ে বসে আছে। পা ঝুলিয়ে দিয়েছে পানির ওপর। চোখ নদীর তীরে। ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাওয়া রহস্যময় সবুজ জঙ্গল আর রুক্ষ পাথরের চাঁই দেখছে। চারপাশে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। তবে মাঝে মধ্যে এক আধটা পাখি উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। যতদূর তাকানো যায় দেখা যাচ্ছে ধূসর-নীল রঙের লেকের বিশাল বিস্তৃতি। বিশ্বাস করতে পারা যায় না যে এই জলাভূমির শেষ আছে, সেখানে আছে আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো পর্বশ্রেণী। সেই পর্বতশ্রেণীর চূড়াগুলো ঘন সবুজ গাছে আচ্ছাদিত। আজকে গরম পড়েছে প্রচণ্ড, এক তিল বাতাস নেই, ঢেউ ওঠেনি লেকের পানিতে। বড়

মাছগুলো সাঁতরে বেড়াচ্ছে শীতল লেকের নিঃশব্দ গভীরতায়।

রাতের আগে স্যান কার্লোসে পৌঁছুতে পারব না আমরা।

'এদিকের লোক সূর্যকে কি নামে ডাকে তা জানেন?' হঠাৎ বলল ব্রেনেকার। 'ওরা সূর্যকে বলে দোজখের আগুনের ধুলো। গরম যদি এত না হতো···আর মশা···'

হাতের ঝাপটায় বনাঞ্চল দেখাল সে। 'কিন্তু বলে লাভ নেই। এই অঞ্চল আসলেই একটা দোজখ।'

এটা সুমো ইন্ডিয়ান আর মশার রাজ্য। এখানে আছে রামা ইন্ডিয়ানদের শেষ বংশধর; য্যামবোস (মেসটিযোস; অর্ধেক ইন্ডিয়ান অর্ধেক নিগ্রো) আর সতেরো এবং আঠারো শতাব্দীতে ক্যারিবীয়ানে নিয়ে আসার সময় জাহাজ ডুবি হওয়া নিগ্রো ক্রীতদাসদের বংশধর। জাহাজ ডুবি হওয়ার পর কিছু নিগ্রো কাঠকুটো ধরে তীরে ভেসে আসতে পেরেছিল, তারাই পরবর্তীকালে বসতি করে এখানে। তাদের বংশধররা এখন ভালই আছে, আরামদায়ক ঘরে বাস করে বেশিরভাগ। নিগ্রোদের পেশা এখানে বিচিত্র; এই উর্বর জমিতে প্রচুর ফসল হয় বলে ধান, কালো বীন, ইউক্কা আর কলার চাষ করে ওরা। এছাড়া মাছ ধরে, নিজেরা সোনা খুঁজে বেড়ায়, গাছ কাটে অথবা খনিতে কাজ করে। আর সুমোরা, নিকারাগুয়ার আদিতম ইন্ডিয়ান জাতি, এখনও তীরধনুক নিয়ে শিকার করে বেড়ায়। চাষবাস করে না, জমি থেকে আর কিছুই সংগ্রহ করে না, সোনা ছাড়া।

'এখানে শুধু সোনাই আছে তা কে বলবে,' বলল ব্রেনেকার। 'হয়তো এমারেল্ড আছে। ইউরেনিয়ামও থাকতে পারে।'

নিকারাগুয়ার এদিকটায় আজ বিশ বছর ধরে আছে ব্রেনেকার, তবে বিশ ভাগের এক ভাগ জায়গাও এখনও দেখা হয়নি ওর। এই জনবিরল অঞ্চলের উত্তরে, দুটো নদী বয়ে গেছে। একটা রিয়ো কোকো, নিকারাগুয়ার ভেতর দিয়ে গেছে; অন্যটা গেছে হন্ডুরাসের ভেতর দিয়ে। এই দুই নদীর মাঝখানে যে তিনকোনা

ব-দ্বীপ আছে, সেটা কারও জমি নয়। ওটাকে চিহ্নিত করা হয়েছে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে। কোন আইন নেই সেখানে, তীরধনুক আর কোল্ট রিভলভারের আইন ছাড়া। নিকারাগুয়ায় এমন একজনকেও আমি পাইনি যে বলতে পারে ওখানে কারা থাকে, কি তাদের পেশা, কি জন্মে জমিতে, কি ধরনের খনিজ সম্পদ লুকিয়ে আছে মাটির নিচে।

'আমি ওখানে একদিন গিয়েছিলাম,' আমাকে বলল ব্রেনেকার। 'জন্তু জানোয়ারের তৈরি একটা পথ ধরে জিপ নিয়ে বেশ ভেতরে ঢুকে পড়েছিলাম। দু'দিকে গাছের সারি। মাঝখানে পথ। হঠাৎ দেখলাম সামনে পথ বন্ধ। একটা বড় গাছ পড়ে আছে পথের ওপর। ব্যাপার কি জানতে সঙ্গের ছেলেটাকে পাঠালাম আমি। দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে এলো সে। গাছ ছিল না ওটা, আসলে বিরাট মোটা একটা সাপ। শরীর মুচড়ে নড়ে উঠল ওটা, ধীরে ধীরে এগোতে লাগল আমাদের দিকে। তারপর...' একটু চুপ করে কি যেন ভাবল ব্রেনেকার, তারপর বলল, 'গত বিশ বছরে এদেশের প্রায় সব ধরনের সাপই আমি দেখেছি। আপনাকে এই নিশ্চয়তাও দিতে পারি যে কিভাবে অস্ত্র চালাতে হয় সেটাও আমি ভালই জানি। কিন্তু সেদিন আমি রিভলভার ছুঁয়েও দেখিনি, যেখানে রাখা ছিল সেখানেই থাকল ওটা, অ্যাক্সিলেটার দাবিয়ে জিপ ছুটিয়ে স্রেফ পালিয়ে এসেছিলাম।'

লেক নিকারাগুয়ার দক্ষিণে স্যান হুয়ান নদী। স্থল অভ্যন্তরীস্থ সাগরের মিঠে পানি আটলান্টিক সাগরে নিয়ে ফেলে নদীটা। স্যান কার্লোস শহরটা একেবারে নদী মোহনায়। বেশির ভাগ বাড়িই কাঠের তৈরি। কোন কোনটা আবার কাঠের পিলারের ওপর দাঁড়ানো। কাঠের ব্যবসা এই অঞ্চলের প্রধান ব্যবসা। স্যান হুয়ান নদীতে ভাসিয়ে স্যান হুয়ান ডেল নর্টে, আটলান্টিক মহাসাগরের বন্দরে নেয়া হয় এক নম্বর কাঠের গুঁড়ি। সেখানে নোঙর ফেলে

কাঠের জেটিতে ভিড়ে থাকে জাহাজগুলো। জ্বলন্ত উনুনের মতো উত্তপ্ত অঞ্চল। বাতাস নেই বললেই চলে। চৌকো মাথার চোখ সরু ইন্ডিয়ান, নিগ্রো, মুলাটো, প্রায় শ্বেতাঙ্গ–সবাই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পোশাক পরে আছে। শার্ট আর ট্রাউজার্স। সবাই হাঁটা চলায় অত্যন্ত ধীর। দেখে মনে হয় না মাটিতে হাঁটছে, যেন পানির নিচে নড়চড়া করছে সবাই। একটু খেয়াল করলে মনে হয় কিছু একটার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। কিন্তু কিসের জন্যে? স্যান কার্লোস যেন দুনিয়ার শেষ প্রান্তে, আর এখানের লোকগুলো গো-কধাঁধায় পড়ে ঘুরে ঘুরে মরছে।

কয়েক দিন না গেলে কেউ টের পাবে না যে স্যান কার্লোসের গলিগুলোতে জুয়োর আড্ডা আছে। সেখানে জুয়াড়ীরা ডলার, করডোবা আর সোনার গুঁড়ো হারে-জেতে। আড্ডাগুলোতে আর আছে মেয়েমানুষ। মনে প্রশ্ন জাগে, কোথা থেকে এলো ওরা। জবাবটা যেন কারোরই জানা নেই। ইন্ডিয়ান মহিলা নাহয় থাকতে পারে; কিন্তু বাকিরা? যে রহস্যময় পথে ওরা এই দুর্গম পোড়ো শহরে পৌঁছেছে সেটা হয়তো বুয়েন্‌স্ আয়ার্স হতে আসা। কিন্তু যদি তা-ই হবে তাহলে বলতে হয় ওরা এতই আগে এসেছে যে মাতৃভাষা ভুলে গেছে। বাজে স্প্যানিশ বলে ওরা, মাঝে মাঝেই ব্যবহার করে ইন্ডিয়ান শব্দ। সবাই ওরা অপেক্ষায় আছে, একদিন কোন খদ্দের এতই সোনার গুঁড়ো দেবে যে স্যান কার্লোস ছেড়ে চলে যেতে পারবে চিরদিনের মতো।

স্যান কার্লোসের সবাই যে সোনা খুঁজতে নিয়োজিত তা নয়। তবে যারা এখনও খুঁজে বেড়ায় না তারা ভবিষ্যতেও খুঁজবে না এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। আর খুঁজুক বা না খুঁজুক, সোনা নিয়ে সবাই কল্পনায় মেতে আছে।

সোনার উৎস এত কাছে আছে বলেই সম্ভবত নতুন মুখ দেখলে স্যান কার্লোসের মানুষের মনে কোন কৌতূহল জাগে না। জার্মানরা আমাকে শহরের মুখে ছেড়ে যাবার কিছুক্ষণ পর হোটেল

খুঁজে ভেতরে ঢুকলাম আমি। প্রায় নির্বিকার চেহারায় আমাকে অভ্যর্থনা জানাল হোটেলের মহিলা মালিক। হোটেলে মাত্র একটা ঘরই খালি আছে। ঘরটা এক তলায়, তবে মশারি আছে; তাছাড়া জানালা দিয়ে লেকের নৈসর্গিক দৃশ্যও দেখা যায়। মহিলা আমাকে জানাল স্যান কার্লোসে এলেই ওই ঘরে ওঠে গার্ডিয়া ন্যাশিয়োনালের একজন ক্যাপ্টেন। বলার ভঙ্গিতে বুঝলাম ঘর নিতে আমি দ্বিধা করলে সেটা অভদ্রতা হিসেবে গণ্য করা হবে। সেই ক্যাপ্টেন (বেচারা! ঘরে থাকতে পেল না!) এখন আছে নিকারাগুয়ার অন্য প্রান্তে।

অফিসার একটা রাইফেল, একটা খালি অ্যাম্যুনিশন পাউচ, দু'তিনটে খাকি শার্ট আর ফ্রেমে বাঁধাই করা একটা ছবি রেখে গেছে। মহিলার ছবি। চেহারা আকর্ষণীয়, চুলের রঙ বাদামী; কিন্তু দেহটা মোটা আর বেঁটে।

এই মিলিটারি এবং প্রেমময় স্মৃতির পাশাপাশি ঘরে আছে বেশ কয়েকটা বড় ফুলদানী। ওগুলোর অর্ধেকটা মাটিতে ভরা। এছাড়া কাঠের তক্তা, বাক্স আরও সব জঞ্জাল স্তূপ করে রাখা আছে ঘরের কোণে। সব মিলিয়ে নিকারাগুয়ার সবচেয়ে ছোট হোটেল গেস্টের জন্যে চমৎকার আবাসস্থল। ওখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে সার্পেন্ট মাইনিউট। এই ব্যাপারটাই আমার পছন্দ হলো না।

কয়েক সপ্তাহ আগে ম্যানাগুয়ায় ঠিক এরকম এক স্তূপের ভেতরেই একটা সার্পেন্ট মাইনিউট পেয়েছিল এক ইউরোপিয়ান। কথাটা মনে হতেই আমার মনে পড়ল, সার্পেন্ট মাইনিউটের দাঁত ছোট, কামড় দিতে পারে শুধু আঙুলের চামড়া আর গোড়ালির মতো জায়গায়। পায়ে মোজা পরে যদি মশারির নিচে হাত মুঠো করে পড়ে থাকি, তাহলে নিরাপদেই থাকার কথা।

স্যুটকেসটা ঘরের কোনায় নামিয়ে পলাতক কয়েদী অ্যালভারেজকে খুঁজতে বেরলাম আমি।

তেরো

শিগ্‌গিরই টের পেয়ে গেলাম যে অ্যালভারেজের সঙ্গে যোগাযোগ করা সহজ হবে না। যাকেই জিজ্ঞেস করতে গেলাম, গুটিয়ে গেল শামুকের মতো। মনে হলো দুটো চিন্তার দোলায় দুলছে। হয় আমি একজন পুলিশ অফিসার, তাকে ধরে নিয়ে যেতে আমাকে পাঠানো হয়েছে, নাহয় আমি একজন প্রাক্তন কয়েদী, এখানে এসেছি পুরনো শত্রুতার জের ধরে।

স্যান কার্লোসের জুয়োর আড্ডাগুলোতে তিনদিন তদন্ত সেরে আমি জানলাম যে অ্যালভারেজের একটা মোটর বোট আছে। সেটায় করে মাসে দু'বার লেকে বেরিয়ে পড়ে সে, ব্যবসা করে তীরবর্তী ইন্ডিয়ান গ্রামগুলোর সঙ্গে। তবে আমার কপাল মন্দ, স্যান কার্লোস ছেড়ে মাত্র চলে গেছে অ্যালভারেজ, কবে ফিরবে কেউ তা জানে না।

আপাতত ওকে ভুলে গিয়ে বন্দরে ঘুরতে লাগলাম আমি। উদ্দেশ্য জেলেদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। সেখানে আরেকটা দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। অতি ঠেকায় না পড়লে এখানে কেউ হাঙর শিকার করে না। তীরে এনে হাঙর কাটবে তেমন একটা জায়গাও বন্দরের কোথাও চোখে পড়ল না আমার। জেলেরা, বেশিরভাগই ইন্ডিয়ান, তাদের নৌকো ভরে মাছ নিয়ে বন্দরে এসেছে। কিন্তু সেই সব রংবেরঙের মাছের মধ্যে একটা তিনকোনা পাখনাও দেখলাম না।

কয়েকজন ইউরোপিয়ান আমাকে একটা ছোট ফিশারির কথা বলেছে। ফিশারিটা স্যান কার্লোস থেকে বারো মাইল দূরে। ওটার মালিক লুই পীচার্ড নামের এক বেলজিয়ান। আজ দশ বছর হলো ফিশারিটা চালাচ্ছে সে। প্রথম ইন্ডিয়ান জেলের সঙ্গে কথা বলে বেশ দ্বিধায় পড়ে গেলাম। কি যেন একটা আছে তার আচরণে। হাঙর শিকারের কথায় শুধু হুঁ-হাঁ তো করছেই, সেই সঙ্গে প্রসঙ্গ থেকে সরতে না পেরে বিব্রত হচ্ছে। ভাব দেখে মনে হলো হাঙরও বোধহয় ওদের দেবতা।

প্রথমে ভাবলাম জেলেরা আমাকে সন্দেহ করছে, কোন একটা পরিকল্পনা আছে আমার, সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে ওদের অভ্যাস আর রোজগারের ওপর প্রভাব পড়বে। সেজন্যেই অপেক্ষা করছে জেলেরা। আগে বুঝে নিতে চাইছে আমার পরিকল্পনা কি। কিন্তু আমার ধারণা ভুল ছিল। অন্যান্য কারণে আমার কাছে মুখ খোলেনি ওরা। কি কারণে মুখ খোলেনি সেটা লুই পীচার্ডই আমাকে প্রথমে জানাল।

স্যান কার্লোসের কাছেই লেকের তীরে একটা বাংলোয় থাকে পীচার্ড। আমি যখন সিয়েস্টার সময়(বৈকালিক বিশ্রাম) দরজায় টোকা দিলাম, একটা রকিং চেয়ারে চোখ বন্ধ করে পড়ে ছিল ও, ব্যস্ত ছিল দৈনিক অর্চনায়। এই কাজটি দুপুর দুটো থেকে সন্ধে ছয়টা পর্যন্ত করে থাকে ও। ওয়াইন কূলার থেকে বরফের টুকরো বের করে চোষে, তারপর মুখে আর ঘাড়ে ঘষতে থাকে। ওকে পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে রেফ্রিজারেটার পর্যন্ত যাওয়া আসা করতে থাকে ওর চাকর।

সত্যি অসম্ভব গরম। ব্লো ল্যাম্পের নিচে রাখলে সীসা যেমন দ্রুত গলে যায়, তেমনি করেই তাপের প্রবাহে গলতে থাকে বরফ। তবুও বেলজিয়ানের শরীরটা দেখার মতন। ওজন পুরো দুইশো বিশ পাউন্ড। মোটা ঘাড়, মাংসল হাত আর মোটা মোটা আঙুল, ফুলে ওঠা পাপড়ির তলায় প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ধূসর দুটো খুদে

চোখ–সব মিলিয়ে দর্শনীয়। শরীরের রং আগুনে পোড়া ইঁটের মতো লালচে। সর্বক্ষণ *অ্যাপোপ্লেক্সি হবার সম্ভাবনার মধ্যে বাস করছে পীচার্ড।

কেন স্যান কার্লোসে এসেছি জানানোর পর কিছুক্ষণ চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল পীচার্ড, তারপর বলল, 'আপনাকে আমি আশা করছিলাম। কয়েকজনের কাছে শুনলাম আপনি অ্যালভারেজকে খুঁজছেন।' আবার থামল পীচার্ড। ধূসর ক্ষুদে চোখ দুটো একটু কঠোর হয়ে গেল। 'ওকে কিজন্যে চাই আপনার?'

আরেকবার আমাকে হাইতির ঘটনা বলতে হলো। জানাতে হলো যে ক্যাবেন চৌকাউনের ক্লাবে প্রাক্তন এক কয়েদীর কাছ থেকে অ্যালভারেজের কথা জানতে পেরে এসেছি। দেখে মনে হলো আমার কথা শুনে বেশ আশ্বস্ত হয়েছে বেলজিয়ান।

'অ্যালভারেজ আমার সঙ্গে কাজ করে,' বলল পীচার্ড। 'ফিরে এলে ওর সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব, অবশ্য ও যদি পরিচিত হতে চায় তাহলেই।'

এক ঘণ্টা পর, তৃতীয় ড্রিঙ্ক শেষে গোপন তথ্য বিনিময়ে আগ্রহী হয়ে উঠল বেলজিয়ান। পীচার্ডও তার কাজ শুরু করেছিল হাঙর শিকারের মাধ্যমে। তাকেও অবাক করেছিল ইন্ডিয়ান জেলেদের দূরে সরে থাকা। সে দশ বছর আগের কথা। মাত্র কলোম্বিয়া থেকে এসেছে পীচার্ড।

মিঠে পানির হাঙরের খবর পেয়েই স্যান কার্লোসে এসেছিল সে। ম্যানাগুয়ায় থাকতে শুনেছিল লেক নিকারাগুয়ার হাঙর কখনও ধরা পড়েনি। এখানে এসে একটা ছোট ফ্যাক্টরি দেয় তীরে। আটলান্টিক তীরের ব্লুফিল্ডের এক চাইনিজ ব্যবসায়ী ওকে কথা দিয়েছিল সমস্ত পাখনাই কিনে নেবে।

পীচার্ডের সমস্যার শুরু হলো জেলেদের কাজে নিতে গিয়ে।

---

*মস্তিষ্কের রগে বাধা সৃষ্টি হওয়া বা ছিঁড়ে যাওয়া। ফলে শরীর অবশ হয়ে যেতে পারে।

লেকের বেশির ভাগ জেলেই ইন্ডিয়ান। আর ইন্ডিয়ানরা কিছুতেই হাঙর ধরতে রাজি নয়। নিকারাগুয়ার সব কয়টা ইন্ডিয়ান জাতির প্রাচীন বিশ্বাস বলে হাঙর পবিত্র প্রাণী, কিছুতেই হাঙরকে আক্রমণ করা যাবে না। ইন্ডিয়ানরা এখনও হাঙরের পুজা করে। হাওয়াইয়ের ক্যানাকাস ইন্ডিয়ানরা পুজা করে কামো হোয়া লি-এর। ওটাই হাঙরদের রাজা। বিশাল আকৃতি। কেউ কখনও দেখেনি। তবে বলা হয় ঝড়ে পড়ে গেলে বিপদগ্রস্ত জেলেকে পথ দেখায় কামো হোয়া লি। তাকে ডাকতে হলে নৌকোর ওপর একটা আগুন জ্বেলে জোরে জোরে ডাকতে হয়, সেই সঙ্গে স্থানীয় আওয়া গাছের রস ঢালতে হয় পানিতে। কামো হোয়া লি নিজে আসে না, তবে প্রজাদের একজনকে পাঠিয়ে দেয় পথ হারানো জেলেকে পথ দেখানোর জন্যে।

স্যান কার্লোসের ইন্ডিয়ানরা এত দূরে যায় না যে বাড়ি ফেরার জন্যে সাহায্য চাইতে হবে, তবে কেউ হাঙর শিকারের কথা চিন্তা করছে শুনলেই ওরা আতঙ্কে চোখ বড় বড় করে।

গুয়ারোর বোতল আর অন্যান্য উপহার দিয়ে দশজন ইন্ডিয়ান জেলেকে শেষ পর্যন্ত রাজি করাতে পারল পীচার্ড, লোভের কাছে পরাস্ত হলো প্রাচীন বিশ্বাস। দু'মাস পরে চারটে নৌকো করে লোক পাঠাতে পারল পীচার্ড।

শুধু হাঙরের পাখনা বেচে যে টাকা এলো তাতেই এই ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভাল চলে যাবার কথা। ব্লুফিল্ডের চাইনিজ আর তার সঙ্গী ব্যবসায়ীরা শীঘ্রি বুঝতে পারল যে সাগরের হাঙরের চেয়ে লেকের হাঙরের পাখনার মান উন্নত। ছয় মাস ঠিক মতোই হাঙর শিকার চলল, তারপর একদিন শেষ নৌকোটা তীরে এসে পৌঁছেছে এমন সময় ভূমিকম্প শুরু হলো।

তাতে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না, নিকারাগুয়ায় ভূমিকম্প স্বাভাবিক ঘটনা, প্রতি ঋতু পরিবর্তনের সময়ে সাধারণত একআধবার হয়; লণ্ঠনগুলো দুলতে থাকে, মাটির নিচে গুড় গুড়

আওয়াজ হয়, তারপর দু'এক মিনিট পর থেমে যায় সব। কিন্তু সে-বছর দুর্ভাগ্যক্রমে প্রবল ভূমিকম্প হলো। কয়েক ঘণ্টা থরথর করে কাঁপল জমি, লেকের পানি ফুঁসে ওপরে উঠতে লাগল।

কেন প্রকৃতি এমন বিরূপ হয়েছে তার ব্যাখ্যা নিজেরাই বের করে নিয়ে দল বেঁধে ফিশারি ছেড়ে চলে গেল ইন্ডিয়ান জেলেরা। এমনকি সপ্তাহের পাওনা টাকাও নিয়ে গেল না।

নিক-ন্যাক আর অ্যালকোহলের পেছনে পীচার্ডের প্রচুর কর্ডোবা খরচ হলো, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না, একজন ইন্ডিয়ানও ফিরে এলো না হাঙর শিকার করতে। জেলে ভাড়া করে আনতে আটলান্টিকের তীরে গেল পীচার্ড। সেখানেও লোক জোগাড় হলো না। কেউ আসতে রাজি নয় লেক নিকারাগুয়ার এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে এমন সময় ওর সঙ্গে পরিচয় হলো অ্যালভারেজের। তখন মাত্র ব্লুফিল্ড থেকে ফিরেছে অ্যালভারেজ।

'আমার অবস্থা বললাম ওকে,' বলল লুই পীচার্ড। 'হাঙর শিকার ওকে আগ্রহী করে তুলল, বলল ফিশারি চালু করলে আমার সঙ্গে কাজ করতে রাজি আছে ও। এক মাস পর সাতজন ইন্ডিয়ানও যোগ দিল আমাদের সঙ্গে।'

পরদিন দুপুরে লুই পীচার্ডের সঙ্গে ফিশারিতে গেলাম। স্যান কার্লোসে প্রতিদিনের মাছ নিয়ে যে মোটর বোটটা যায়, সেটা হাঙরের মাংস দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। মাত্র রওয়ানা হবে। জেলেদের সকালের কাজ শেষ। কয়েকজন ঘুমাচ্ছে তাদের বোটে, অন্যরা ছাউনির ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কোথায় যেন। মরার মতো ভাবভঙ্গি আর চোখের শূন্য দৃষ্টি কেন তা বুঝতে ওদের কাছে গিয়ে গন্ধ শোঁকার দরকার নেই; এমনিতেই প্রচণ্ড পরিশ্রম, সেই সঙ্গে তপ্ত আবহাওয়া, তারওপর মারিজুয়ানা টেনে কাহিল হয়ে পড়েছে সব কয়জন। প্রচুর কর্ডোবা খরচ করেও পীচার্ড যা পারেনি তাই করে দেখিয়ে দিয়েছে

অ্যালভারেজ, ইন্ডিয়ানদের মারিজুয়ানা ধরিয়ে।

তবে মারিজুয়ানাই এই ফিশারির এক মাত্র অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য নয়।

পরবর্তী কয়েকদিনে আমি বুঝলাম, খোলা যে দুটো ছাউনিতে হাঙর কাটা হয়, যে পাটাতনে হাঙরের চামড়া ছাড়ানো হয়, এবং যেখানে দাঁড়িয়ে বয়স্কা মুলাটো মহিলা রান্না করে, এই জায়গাগুলো একেবারেই অস্পৃশ্য। কাছের গ্রামগুলোর সঙ্গে যেন অদৃশ্য একটা কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে জায়গাগুলো আলাদা করা আছে। যে নয়জন ইন্ডিয়ান জেলে ফিশারিতে কাজ করে, তারা ছাড়া আর কোন ইন্ডিয়ান ভুলেও এদিকে আসে না। আর এই নয়জন জেলেকে যে তাদের জাতি বহিষ্কার করেছে এতেও কোন সন্দেহ নেই।

বছরের পর বছর এখানেই থাকে জেলেরা। মাসে শুধু দু'তিন বার স্যান কার্লোসে যায় জুয়ো খেলতে, মারিজুয়ানা কিনে যে-টাকা পকেটে রয়ে যায়, সেটাও খরচ করে আসে ওরা ঘোরের মধ্যে। তবে ওদের রোজগার প্রচুর। শিকারের পরিমাণ অনুযায়ী টাকা দেয় পীচার্ড। আর লেকের এদিকে হাঙরের কোন অভাব নেই।

একদিন বিকেলে পীচার্ডের নৌকোয় করে লেকের ওপর ঘুরতে বেরলাম। ফেরার সময় তীর থেকে কয়েক শো গজ দূরে আছি, এমন সময় হঠাৎ আঙুল তুলে পানির একটা জায়গা দেখাল বেলজিয়ান। পানি ওখানে ধূসর।

পীচার্ড বলল ওই জায়গার এক শো গজের মধ্যে মাছ ধরে না ইন্ডিয়ানরা। লেক তীরবর্তী ইন্ডিয়ানদের মাঝে বংশ পরম্পরায় একটা প্রাচীন কথা চালু আছে। ওই ধূসর পানির রাজ্যে বাস করে অস্বাভাবিক বিরাট আকৃতির একটা হাঙর। বয়স্ক ইন্ডিয়ানরা শপথ করে বলে যে তারা ওটাকে দেখেছে। তবে কেউ কখনও ভুলেও ওটাকে ধরার চেষ্টা করেনি। যে চেষ্টা করবে তার সাংঘাতিক ক্ষতি

হয়ে যাবে, কারণ এই হাঙরটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটা এমারেল্ড খনির প্রহরী। সেই এমারেল্ড খনি লেকের তলায় আছে। কেউ যদি ওখানে হস্তক্ষেপ করে তাহলে ওলটপালট হয়ে যাবে সমস্ত দুনিয়া।

শোনা যায় বিশ বছর আগে কিছু ইন্ডিয়ান এই নিষেধাজ্ঞা না শুনে খনির রহস্য জানতে গিয়েছিল। তারা চেয়েছিল খনি আবিষ্কার করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে। মোট পনেরোজন ওরা নৌকোয় করে এলো। বলা হয় খনি যেখানে থাকার কথা সেই জায়গায় লেকের গভীরতা খুব বেশি হলে এগারো ফ্যাদম। ডুব দিল সাহসী কয়েকজন। একজনও তলা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারল না, ব্যর্থ হয়ে খালি হাতে গ্রামে ফিরতে হলো ওদের। পরবর্তী তিন সপ্তাহে মারা পড়ল প্রত্যেকে। মৃত্যুর কারণ সম্ভবত বিষক্রিয়া। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল এই কাহিনী। পানির গভীরতা মেপে দেখা গেল আসলে ওই জায়গার গভীরতা যা ভাবা হয়েছিল তার পনেরো-বিশ গুণ বেশি। হতাশ এবং বিরক্ত হয়ে ফিরে গেল এমারেল্ড খুঁজতে আসা লোকগুলো।

'তবে আসল কথা হলো ইন্ডিয়ান ডুবুরিরা সবাই বেঁচে আছে,' শেষে বলল পীচার্ড, 'কিন্তু কম কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোন ইন্ডিয়ানও নির্দ্বিধায় নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে ওখানে মাছ ধরার বদলে।'

কয়েক দিন পর ফিরে এলো অ্যালভারেজ। আমি তার আগের দিনই স্যান কার্লোসে চলে এসেছি। কাঠের তক্তায় নিকারাগুয়ান পতাকা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থেকে পিঠে ব্যথা হয়েছে খুব। শুয়ে আছি হোটেলের বিছানায়, দরজায় টোকা দিল স্বয়ং প্রাক্তন কয়েদী।

বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো যে ধূসর চুলের এই লম্বা চওড়া লোকটা কোন স্বচ্ছল চাষী নয়, আসলে পাকা জেলঘুঘু। জিন্সের প্যান্ট আর চেক শার্ট পরে আছে অ্যালভারেজ। হাতে একটা চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট। আন্তরিকতার সঙ্গে আমার সঙ্গে হাত মেলাল

সে। গোল মুখে ফুটে উঠল বন্ধুত্বের হাসি। ওর সঙ্গী কয়েদীর কথা যখন উল্লেখ করলাম, একটুও বিস্মিত হলো না অ্যালভারেজ, মুখের একটা পেশীও কাঁপল না। ঠোঁটে সেই একই প্রশান্ত হাসি, অপেক্ষা করছে আমি বলব কেন এখানে ওকে খুঁজতে এসেছি। কথা শেষ করার আগেই একটা ব্যাপার বুঝে গেলাম, আপাত বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি আর নিষ্পাপ চেহারার আড়ালে তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে মেপে নিচ্ছে লোকটা। শীতল কিছু একটা আছে অ্যালভারেজের মধ্যে, যেকারণে একটু খেয়াল করলেই ওর হাসিখুশি ভঙ্গিটা মেকি মনে হয়। ও আমাকে জানাল আগামী কয়েকদিনের মধ্যে স্যান কার্লোস ছেড়ে কোথাও যাচ্ছে না। আমার সঙ্গ নাকি ভাল লাগবে ওর। কিন্তু আমার যেন মনে হলো অন্তর থেকে কথাটা বলেনি অ্যালভারেজ।

পরবর্তী দিনগুলোতে বেশ কয়েকবার ওর সঙ্গে দেখা হলো আমার। দোকানে দোকানে বেশি দেখলাম ওকে, আগামী অভিযানের রসদপত্র কিনছে। একবারও আমার সঙ্গে এমন আচরণ করল না যে মনে হবে আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একই সঙ্গে এটাও বুঝলাম আমার সঙ্গ লাভের বিশেষ কোন আগ্রহ নেই ওর। অত্যন্ত ভদ্র শীতলতায় আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলল অ্যালভারেজ।

'ও ভয় পায় ওকে অতীত নিয়ে প্রশ্ন করা হবে,' আমাকে জানাল পীচার্ড। 'অনেক আগে থেকেই এই ভয়টা কাজ করে ওর ভেতরে।'

আমি অ্যালভারেজের আসল নাম জানি না বা কেন তার শাস্তি হয়েছিল সেটাও আমার জানা নেই, কিন্তু ও স্যান কার্লোস ছেড়ে যাবার দু'এক দিন আগে অনুরোধ করলাম আমাকে যেন সঙ্গে করে নিয়ে যায়। বেশ খুশি হয়েই রাজি হলো অ্যালভারেজ।

যাত্রার আগের শেষ কয়েকদিন আমি লেকের ওপর, নৌকোয় মাছ ধরে সময় কাটালাম। নৌকোটা আমাকে ধার দিয়েছে পীচার্ড। হয় ও নিজে নাহয় অ্যালভারেজ এলো আমাকে সঙ্গ

দিতে।

নভেম্বরের বিকেলে কোরানা বন্দরে দাঁড়িয়ে ক্যারিবীয়ানমুখী জাহাজে অভিবাসী উঠতে দেখছিলাম, সে কতদিন আগের কথা? মাত্র কয়েক মাস, অথচ ভাবতে গেলে মনে হয় অনেক আগের কথা। এরইমধ্যে হাঙর শিকারের সব কয়টা পদ্ধতি আমি চাক্ষুষ দেখেছি। ক্যারিবীয়ানে নানা জায়গায় গিয়ে একটা কথা বুঝে গেছি, হাঙর শিকার আজও আমাকে আলোড়িত করে, ঠিক যেমন আলোড়িত করেছিল প্রথম রাতে কোজিমারের কূলে।

লেক নিকারাগুয়ায় হাঙর শিকার আরও উত্তেজনাপূর্ণ, কারণ এখানে হাঙর আরও বড় হয়, তাদের খিদেও বেশি সাগরের হাঙরের চেয়ে।

এক সন্ধেয় নৌকো নিয়ে তীরে ফেরার পর অ্যালভারেজ আমাকে প্রথমবারের মতো তার বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ জানাল। ওর বাড়িটা স্যান হুয়ান নদীর মোহনায়, কাঠের একটা জেটির উল্টোদিকে। ওই জেটিতে অ্যালভারেজের বোট লুসিট্রনকে দেখলাম নোঙর করে আছে। পরবর্তী দু'ঘণ্টা আমরা ব্যয় করলাম বোটে রসদপত্র তুলে। বিভিন্ন জিনিস; লবণের প্যাকেট, আয়না, জুতো, বড়শি, দড়ি, পোশাক, সার, গহনা থেকে শুরু করে টুকিটাকি যা আছে সবই নিয়েছে অ্যালভারেজ ইন্ডিয়ানদের কাছে বেচবার জন্যে। পরদিন ভোরের ধূসর আলো ফুটতেই রওয়ানা হলো লুসিট্রন। বোটে আমরা তিনজন আছি। অ্যালভারেজ, বছর তিরিশের এক নিকারাগুয়ান আর আমি। নিকারাগুয়ান একাধারে অ্যালভারেজের সহকারী এবং দেহরক্ষী। এক ঘণ্টা পর আমরা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন সলেন্টিনাম দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছে গেলাম। পনেরোজন চাষী আছে ওখানে, শাকসব্জির চাষ করে, বিক্রি করে স্যান কার্লোস আর আশেপাশের অঞ্চলে। দ্বীপগুলোতে মূলত ধান, ইউক্কা আর কালো বীনের চাষই বেশি হয়। লেকের তীরবর্তী কিছু গ্রাম আছে যেখানে খাদ্যশষ্যের বিনিময়ে সোনার গুঁড়ো দেয়া হয়।

সলেন্টিনামের চাষীরা যে নিকারাগুয়ার সবচেয়ে ধনী চাষী এতে অবাক হবার কিছু নেই। এদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা জীবনে একবারও দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে বাইরে কোথাও যায়নি। তাহলে এত টাকা কী কাজে লাগে তাদের? এই প্রশ্নের জবাব কেউ জানে না, তবে স্যান কার্লোসে শোনা যায়, বংশ পরম্পরায় ধনসম্পত্তি জমিয়ে রাখে এরা, পুঁতে রাখে যার যার ফার্মের জমিতে।

এগারোটায় বোট থামাল অ্যালভারেজ, লকার খুলে দুটো দড়ি বের করল। হাঙর শিকার আমাদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে দুপুরের খাবার জোগাড় করা। ঠিক তিন মিনিটের মাথায় ধরে ফেলা হলো দুপুরের খাবার। পানির তলায় মাত্র কয়েক ফিট দড়ি নামাতেই শক্ত হয়ে গেল ওটা। এখানে মাছ ধরা অ্যাকুইরিয়ামে মাছ ধরার মতোই সোজা। দেখতে দেখতে ধরে ফেলা হলো কয়েক পাউন্ড ওজনের দশ-বারোটা মাছ। লুসিট্রনের ডেকে তড়পাতে লাগল ওগুলো। কি মাছ তা চিনতে পারলাম না।

বড় দুটোকে বেছে নিয়ে বাকিগুলোকে ফেলে দিল নিকারাগুয়ান। হাঙরের খাবার হবে ওগুলো। বাছাই করা মাছগুলোর শরীর ধূসর-কালো, পেটে লম্বা হলুদ দাগ। ওগুলোর চামড়া ছাড়িয়ে কেটেকুটে চারকোল ভরা একটা ধাতব বেসিনের ওপর লটকে রাখা হলো। রান্না শুরু হতেই বোট চালু করে আবার সামনে বাড়ল অ্যালভারেজ; উদ্দেশ্য গায়ে বাতাস লাগানো। মাথার ওপর দিগন্ত প্রসারিত আকাশ, যতদূর চোখ যায় দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না, তবুও বাতাস নেই একফোঁটা। শ্বাস নেয়ার সময় মনে হচ্ছে গনগনে আগুন গিলছি।

দুপুরের খাওয়া শেষে ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝুলিয়ে বোটের তলায় বিশ্রাম নিতে গেল অ্যালভারেজ, চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকল সেখানে সন্ধে হওয়ার আগে পর্যন্ত। সময়টা পার করল দিবাস্বপ্ন দেখে আর একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে। গরমের চোটে কথা বলার ইচ্ছে মরে গেল আমার। ভাবভঙ্গি দেখে

বুঝলাম এই গরম অ্যালভারেজ বা তার সঙ্গীর কোন ভাবান্তর ঘটাতে পারছে না।

যত উত্তরে যাচ্ছি, আঠালো বাতাস যেন আরও ভারী আর ভেজা হয়ে উঠছে। তীরের মাত্র কয়েক গজ দূর দিয়ে চলেছি আমরা। ড্রাগন ফ্লাইয়ের দ্বিগুণ আকৃতির সবুজ পোকা আর বেগুণী প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে লেকের পানির ওপরে। মাঝে মাঝেই পানির ওপর উঠছে বড় বড় বুদ্বুদ। ঠুস করে ফেটে যাচ্ছে ওগুলো, গন্ধযুক্ত বেগুণী ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

পাহাড়ের কাঁধের ওপারে সূর্য ডুবে যাবার পর প্রথমবারের মতো তীরে নাক ঠেকাল লুসিট্রন। ঘাটে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে দশ-বারোজন লোক। ইন্ডিয়ান। অ্যালভারেজ যাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে বেরিয়েছে তাদের মধ্যে এরাই পথে প্রথম পড়ে। কারও গায়ে উল্কি বা পাখির পালক দেখলাম না। চেহারাও পীচার্ডের জেলে বা স্যান কার্লোসের ইন্ডিয়ানদের মতোই। সেই চৌকোনা মাথা আর সরু চোখ, সেই একই রকম তালিপট্টি মারা সুতির পোশাক আর চওড়া কানার টুপি। তীরবর্তী গাছপালার ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট ভাবে তাদের গ্রামটা দেখা যাচ্ছে।

পরবর্তী দিনগুলোতেও যাত্রাপথে মোটামুটি এই একই দৃশ্য দেখলাম। এক জায়গায় কয়েকটা কাঠের কেবিন, পাকা দালানও দু'একটা আছে। অতি রংচঙা পোশাক আর অলঙ্কার পরে কাজ করছে ইন্ডিয়ান মহিলারা। তাদের বসতির পেছনে ছোট এক খণ্ড চাষের জমি। সবকিছু ঘিরে আছে ঘন ঝোপের একটা গোল দেয়াল।

বাকি দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগবিহীন এই গ্রামগুলো দেখলে যেকারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে অ্যালভারেজের জিনিস কেনার জন্যে এরা ব্যাঙ্ক নোট পায় কোথায়। আমার মনেও প্রশ্ন জেগেছিল। তবে একটু খোঁজ নিতেই জানা গেল ইন্ডিয়ানদের অনেকেই প্রতিদিন খনি কিংবা জঙ্গলে কাজ করে টাকা রোজগার

করে।

কাঠুরের দল গাছের গুঁড়ি টেনে নিয়ে এসে লেকের পানিতে ভাসায়। একসঙ্গে অনেকগুলো গুঁড়ি দড়ি দিয়ে বেঁধে সেগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে লগি ঠেলে পৌঁছে যায় স্যান কার্লোসে। শহরের করাত কলে বিক্রি হয় সেসব কাঠ।

ছয়মাস আগে দুঃখজনক একটা ঘটনা ঘটেছে তেমন একটা গ্রামে এবার গেলাম আমরা। এক হতভাগ্য কাঠুরে পানিতে গাছ ভাসাবার পর ভারসাম্য হারিয়ে লেকে পড়ে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে কাছেই ছিল হাঙর। এক কামড়ে কাঠুরের পা কেটে নিয়ে যায় হাঙরটা। লোকটাকে তীরে তোলা হয় বটে, কিন্তু ততক্ষণে শরীরের চার ভাগের তিন ভাগ রক্ত হারিয়েছে বেচারা। কয়েক ঘণ্টা পরই তার মৃত্যু হয়। হাঙরটা তখনও দুর্ঘটনার জায়গায় ঘুরে ঘুরে চক্কর কাটছিল। আরেকজন ইন্ডিয়ান ছুরি হাতে লেকে নেমে আক্রমণ করে বসে শয়তান হাঙরটাকে। কপাল ভাল ছিল লোকটার, সামান্য আহত হয় সে, হাঙরটা মারা যায় তার হাতে।

'তারপর,' বলল অ্যালভারেজ, 'ওরা হাঙরের পেট চিরে ফেলে। পা-টা তখনও প্রায় আস্তই ছিল। ওটা ওরা মৃত ইন্ডিয়ানের পাশেই কবর দিয়েছে।'

শেষ যে গ্রামটায় আমরা গেলাম সেটা একটা পাথুরে ঢালের ওপর, লেকের পাড় থেকে এক দেড় মাইল দূরে। পাঁচ দিন হলো আমরা স্যান কার্লোস ছেড়েছি। এখনও অ্যালভারেজের বেশির ভাগ জিনিসই পড়ে আছে অবিক্রিত।

তিন দিন থাকলাম আমরা ওই গ্রামে। রাতে ফিরে এসে বোটে শুলাম। তবে নিকারাগুয়ান রয়ে গেল ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে। গ্রামে ঘুমাবার সুযোগ পেলে কখনোই বোটে ঘুমায় না সে।

এক শেষ বিকেলে প্রাক্তন কয়েদী নিজে থেকেই আমাকে বলল কেন সে সবকিছু ছেড়ে দুনিয়ার এই শেষ প্রান্তে পড়ে আছে। দুপুরের পর থেকে ব্যস্ত সময় কেটেছে আমাদের অ্যালভারেজের

রসদ বেচে। এই প্রথম দেখলাম করডোবার বদলে অ্যালভারেজকে সোনার গুঁড়ো দিচ্ছে গ্রামবাসী। যে বুড়ো স্বচ্ছ একটা ব্যাগে সোনার পিণ্ড দিল সে তিরিশজন ইন্ডিয়ানের সর্দার। কাঠের কেবিনে থাকে না, লেকের ধারে বাস করে এরা। থাকার জন্যে পাথর আর মাটি লেপে কুঁড়ে ঘর তৈরি করে নিয়েছে। আলাদা বাস করে সর্দার একটা আশ্চর্য বাড়িতে। সাদা ভিলাটা এই অঞ্চলে একেবারেই অবিশ্বাস্য রকমের বেমানান। মনে হলো পাথর যুগের ওপর নির্মিত ছায়াছবিতে রেডিয়োর অ্যান্টেনা দেখেছি।

এই বাড়ি বানাতে ম্যানাগুয়া থেকে এসেছিল স্থপতি আর রাজমিস্ত্রি। অ্যালভারেজ নিজে স্যান কার্লোস থেকে বাড়ির আসবাবপত্র এনে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় ঘরটার ছাদে যে সীলিং ফ্যানটা ঝুলছে সেটাও ওর আনা। ইলেক্ট্রিসিটি না থাকায় পুলি আর গীয়ার হুইল দিয়ে তৈরি জটিল একটা জেনারেটরও বসানো হয়েছে ওটা চালানোর জন্যে। গরমকালে চালানো হয় ওই ফ্যান। গ্রাম থেকে বাচ্চা ছেলেরা আসে, পালা করে আসনে বসে সাইকেলের প্যাডেলের মতো প্যাডেলটা ঘুরিয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ইলেক্ট্রিসিটি উৎপন্ন করে।

এত সব আয়োজন করতে ছোটখাট একটা সোনার পাহাড় খরচ করতে হয়েছে সর্দারকে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, সোনার গুঁড়োর কোন অভাব নেই এখানে। গ্রামের মহিলাদের দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায় এই গ্রাম আর সব গ্রামের মতো নয়। প্রত্যেকের পরনে দামী পোশাক। সেই সঙ্গে মূল্যবান অলঙ্কার।

সুমো ইন্ডিয়ানদের এই বংশধররা জমিতে চাষাবাদ করে না। হাঙর শিকারেও কোন উৎসাহ নেই কারও। থাকবেই বা কেন, সোনা তাদের চাহিদা অনুযায়ী সব কিছুই দিয়েছে।

সোনার ব্যাপারেই সেদিন সন্ধেয় আমার কাছে মুখ খুলল

অ্যালভারেজ। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে আলাপ করার সময় প্রচুর রাম গিলেছে বলেই আমাকে বলতে শুরু করল, নাকি এ কয়দিনে ওর মনে হয়েছে আমরা যথেষ্ট চিনেছি পরস্পরকে? ওর কথা শুনতে শুনতে মনে হলো গত কয়েকদিন দেখা ভোঁতা চেহারার এই মোটা লোকটাকে আমি মোটেও চিনি না। এখন ওর মুখের চিরস্থায়ী হাসিটা নেই। চেহারা জ্বলজ্বল করছে অদ্ভুত এক আভায়।

লুসিট্রনের পেছনে বসে গভীর মনোযোগে তীরের দিকে তাকিয়ে ত ছে সে। হাতের ইশারায় আমাকে দেখাল গ্রামটা। একের পর এক বাতি নিভে যাচ্ছে গ্রামে।

'পাঁচ বছর আগে,' বলতে শুরু করল ও, 'এরাও ছিল বাকিদের মতোই। কোন ভিলা ছিল না, ছিল না কোন সোনার গুঁড়ো। কিছুই ছিল না। ফকির ছিল এরা। তারপর হঠাৎ সোনার খোঁজ পেল। আমরা জানি না খনিটা কে আবিষ্কার করেছে, তবে সম্ভবত বুড়োই হবে। সেই থেকে সোনা বেচেই চলছে এরা। অবশ্য সোনার খনি পেয়েছে সেটা কাউকে বলেনি এরা। এ থেকে দুটো জিনিস প্রমাণ হয়। এক, দেখে যা মনে হয় ততটা বোকা এরা নয়। এরা জানে সরকার খবর পেলে এদের খেদিয়ে খনির দখল নিয়ে নেবে। আর দুই, খনিটা নিশ্চয়ই কোন গোপন জায়গায় আছে।

'অনেকেই চেষ্টা করেছে খনিটা খুঁজে বের করার। স্যান কার্লোস আর ম্যানগুয়া থেকে এখানে এসে পাহাড় আর টিলাগুলোতে খুঁজেছে তারা। ইন্ডিয়ানরা কাউকে বাধা দেয়নি। দফায় দফায় খালি হাতে ফিরে গেছে স্বর্ণ সন্ধানীর দল। সরকার চেষ্টা করলে হয়তো ব্যাপারটা অন্যরকম হতো, কিন্তু আপাতত...'

ভাবনায় ডুবে চুপ করে গেল অ্যালভারেজ। বোটের কোনায় আঙুলের গাঁট দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে টোকা দিল। তারপর বলল, 'পরিস্থিতি আপাতত এরকম। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওই সোনার খনি হাতের নাগালে পাবার আগে দেশ ছেড়ে যাব না। জানি না

কিভাবে ওটা খুঁজে পাব আমি, তবে চিন্তা ভাবনা চালিয়ে যাচ্ছি। সফল হবার কোন উপায় যদি থাকে তো সফল আমি হবই।'

সেরাতে অ্যালভারেজ যখন ঘুমাতে গেল, ঘড়িতে দেখলাম রাত দুটো বাজে। গত দুটো ঘণ্টা একই জায়গায় বসে ছিল প্রাক্তন কয়েদী। সর্বক্ষণ নিঃশব্দে সিগারেট ফুঁকেছে আর অস্বস্তি ভরে হাত কচলেছে। চোখ ছিল গ্রামের দিকে।

সূর্যের আলো চোখে পড়তে আমি যখন ঘুম থেকে উঠলাম তার অনেক আগেই উঠে পড়েছে অ্যালভারেজ। নিকারাগুয়ান লোকটা মাত্র তীর ছেড়ে বোটে এসে উঠেছে, কথা বলছে তার সঙ্গে। সময় হয়ে গেছে স্যান কার্লোসে ফিরে যাবার।

প্রাক্তন কয়েদীর জন্যে এই পাঁচ-ছয় দিন ছিল শুধুই ছোট একটা যাত্রা; আর আমার জন্যে এই দিনগুলো দেশে ফিরে যাবার আগে শেষের কয়েকটা দিন। স্যান কার্লোসে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে আছে সেই দুই জার্মান, আমাকে পৌঁছে দেবে ম্যানাগুয়ায়। সেখান থেকে নিউ ইয়র্কের প্লেন ধরব আমি। নিউ ইয়র্ক থেকে সোজা প্যারিস।

স্যান কার্লোসে ফেরার পথে দেখলাম লেকের পানি এক জায়গায় পাড়ের গজ বিশেক ভেতরে আঙুলের মতো এগিয়ে গেছে। ওখানের সরু সৈকতটা দেখাল অ্যালভারেজ। জানলাম ওটা মৃতদের সৈকত। আগে ইন্ডিয়ানদের রীতি ছিল ওখান থেকে মৃতদের হাঙরের মুখে ছুঁড়ে দেয়া। এখন আর এই নিয়ম পালিত হয় না। পানি ওখানে অস্বাভাবিক রকমের স্বচ্ছ আর গভীর।

'কবে ঘটনাটা ঘটেছিল কেউ তা জানে না,' বলল অ্যালভারেজ। 'তবে আমার ধারণা বছর তিরিশেক আগের কথা। এক ডাচম্যান এসেছিল এখানে হাঙর শিকার করতে। বাড়ি করেছিল লোকটা এখানে। তবে সাধারণ হাঙর নয়, তার পছন্দ ছিল মৃতদেহ খোর হাঙর। ইন্ডিয়ানরা তাদের মৃতদের অলঙ্কারসহই পানিতে ছুঁড়ে দিত, কাজেই ডাচম্যানের বিশেষ

হাঙরের প্রতি আগ্রহের ব্যাখ্যা সহজেই মেলে। শেষকৃত্য অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই হাঙর ধরার জন্যে লেকে দড়ি ফেলত ডাচম্যান। হাঙরের পেট চিরে বের করে নিত সোনা আর এমারেল্ডের অলঙ্কার। লোকটার এই লোভ ছিল আসলে নিছক একটা পাগলামী, কারণ লেকে তো হাঙরের অভাব নেই। তা যাই হোক, লোকে বলে এভাবে প্রচুর ধনরত্ন জড় করেছিল ডাচম্যান। এমনিতেও পাহাড় থেকে জন্তুজানোয়ার মেরে এনে পানিতে ফেলত সে, আশা করত মৃতদেহ খেয়ে যাওয়া কোন হাঙর হয়তো ফিরে আসবে এখানে। ওটার পেটে পাওয়া যাবে সোনা আর এমারেল্ড। তারপর একদিন ইন্ডিয়ানরা জেনে গেল লোকটা এখানে কি করছে।'

দিগন্তের দিকে তাকাল অ্যালভারেজ। তারপর উদাস গলায় বলল, 'বাড়িটা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিল ওরা। জবাই করল ডাচ লোকটাকে।'

***

কিশোর ক্লাসিক

নীল অন্ধকার

মূল: ফ্র্যাঙ্কো পোলি

রূপান্তর: কাজী মায়মুর হোসেন

দিনের আলোয় দিগন্ত বিস্তৃত সুনীল আকাশ
আর রাতের নিকষ কালোয় লাখো তারার রুপোলি ঝিকিমিকি।
আমি চলেছি ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে, আর্নস্ট হেমিংওয়ের
সেই নীল অন্ধকারের দেশে। তখনও জানি না ছোট্ট
ডিঙি নিয়ে রাত-বিরেতে সাগরে যেতে হবে হাঙর শিকারে।
আচ্ছা, বড়শি গিলেছে মস্ত হাঙর, ডুবে গেছে বাতি বসানো
বয়া, বলুন তো, পাঠক, এখন কি করতে হবে?
বলুন তো, কোন্ তিমির পেটে আছে অসম্ভব দামি কস্তুরি?
সোর্ড ফিশের তলোয়ারের গুঁতোয় নৌকোটা আবার
ডুবে যাবে না তো?
শুধু একটা ছোরা সম্বল করে লড়া যায় হাঙরের সঙ্গে?
নৌকোর পাশে ভেসে উঠেছে বিশাল মান্টা রে! এখন?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

High Quality Aohor Arsalan Scan

scan with canon

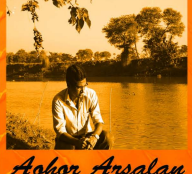

Aohor Arsalan

ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION

Visit Us Now

WWW.BANGLAPDF.NET